إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) সংখ্যা

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরবসম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ ॥ সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) সংখ্যা
৭ই রবিউল আওয়াল, ১৪০৮ হিঃ ॥ ১৩ই কার্তিক, ১৩৯৪ বাংলা ॥ ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৭ইং ॥
বার্ষিক চাঁদাঃ বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
'আহ্‌মদী' ৩১শে অক্টোবর ১৯৮৭ ৪১ বর্ষ ১২ ও ১৩শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
আল কুরআনে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) :		১
হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) :	সংকলনে : মাওলানা সালেহ্ আহমদ	৪
মুকামে মুহাম্মাদ (সাঃ)		
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে	: সংকলনে : মাওঃ আবদুল আযীয সাদেক,	৬
খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)-এর দৃষ্টিতে	: সংকলনে : মাওঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৩
হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ -এর দৃষ্টিতে	: সংকলনে : মৌঃ ফজলুল করিম মোল্লা	১৫
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাঃ)-এর দৃষ্টিতে	: সংকলনে : মৌঃ এইচ, এম, আলী আনওয়ার	২০
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' আইঃ-এর দৃষ্টিতে	: সংকলনে : নাজির আহ্‌মদ ভুঁইয়া	২৩
তোহ্‌ফা (কবিতা)	: শাহ্ মুস্তাফিযুর রহমান	২৭
বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার	: মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, আমীর, বাঃ আঃআঃ	৩২
মৌলিক মানবাধিকার	: মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	৪১
আহ্‌মদের পিয়ালা করে নয়া যিন্দেগী দান	: অনুবাদে : ফারুক মীরপুরী	৪৯
মহানবী (সাঃ) ও মানবাধিকার	: আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	৫০
আদর্শ নবী হযরত রসূল করীম (সাঃ)	: মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ	৫৩
মহিলাঙ্গণ		
জীবনাদর্শের একটু ঝলক	: মাসুদা সামাদ	৫৭
ইসলামের ভেরী (কবিতা)	: বেগম মোস্‌লেমা সালাম	৬০
মানব দরদী রসূল (সাঃ)	: রোকেয়া আহ্‌মদ	৬১
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শাসন ব্যবস্থা	: মাকসুদা রহমান	৬৫
ছোটদের পাতা	: উপস্থাপনায়—'নানা ভাই'	৭১
প্রশ্ন-উত্তর	,,	
ছড়া :	: মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, আমীর বাঃ আঃ আঃ	৭৪
কিশোর মুহাম্মাদ (সাঃ)	: হামিদা খাতুন (সায়েমা)	৭৫
মরু-দুলাল (কবিতা)	: এস, এম, তৌহীদুল ইসলাম	৭৬
খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য	: মাজহারুল হক	৭৭
হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ	: ডাঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	৭৯
এক নযরে মুহাম্মাদ (সাঃ) চরিত	: সংকলনে : 'নানা ভাই'	৮২
সংবাদ :		৮৩
সম্পাদকীয় :		৮৭

মহান সীরাতুন্নাবী দিবস উপলক্ষে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক পাঠিকাকে জানাই মুবারকবাদ।

আঁ হযরত (সাঃ)-এর পুণ্য জীবনালোকে আমরা সকলেই যেন উদ্ভাসিত হইতে পারি এই কামনান্তে আমরা এই সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) সংখ্যা পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিয়া আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। উল্লেখ্য, অনিবার্য কারণ বশতঃ ১২ ও ১৩শ সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ্ ম দী

নব পর্যায়ে ৪১শ বর্ষ : সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) সংখ্যা

৩১শে অক্টোবর ১৯৮৭ইং : ৩১শে ইখা ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ১৩ই কার্তিক ১৩৯৪ বাংলা

আল কুরআনে হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)

১। তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্‌ও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন, এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন ; বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। তুমি বল, তোমরা আল্লাহ্‌ ও এই রসূলের আনুগত্য কর ; কিন্তু যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহা হইলে (জানিও) আল্লাহ্‌ কাফিরদিগকে আদৌ ভালবাসেন না। (সূরা আলে ইমরান : ৩৩ আয়াত)

২। নিশ্চয় মু'মিনদের উপর আল্লাহ্‌তা'লার কত বড় এহসান যে, তিনি তাহাদের মধ্য হইতেই একজন মহামহিমান্বিত রসূলকে প্রেরণ করিয়াছেন, যিনি তাহাদের নিকট আল্লাহ্‌র আয়াত পাঠ করেন, তাহাদিগকে সকল প্রকারের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র করেন এবং তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দান করেন অথচ তাহার আগমনের পূর্বে এই সকল লোক প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে পড়িয়াছিল।
(সূরা আলে ইমরান, ১৬৫ আয়াত)

৩। হে রসূল ! তোমার রব্বের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে, তাহা (লোকদের নিকট), পৌঁছাইয়া দাও, এবং যদি তুমি এইরূপ না কর তাহা হইলে তুমি তাঁহার পয়গাম আদৌ পৌঁছাইলে না, এবং আল্লাহ্‌ তোমাকে মানুষের কবল হইতে রক্ষা করিবেন, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ কাফির জাতিকে কখনও হেদায়াত দান করেন না।
(সূরা আল মাইদাহ্‌ : ৬৮ আয়াত)

৪। তুমি বল, 'হে মানবজাতি ! নিশ্চয় তোমাদের সকলের জন্য আমি সেই আল্লাহ্‌র রসূল, যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের আধিপত্যের অধিকারী, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই,

তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতএব, তোমরা ঈমান আন আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূল এই উম্মী নবীর উপর, যে ঈমান আনে আল্লাহ্‌র এবং তাঁহার বাণী সমূহের উপর এবং তোমরা তাহাকে অনুসরণ কর যেন তোমরা হেদায়াত প্রাপ্ত হও।

(সূরা আল আ'রাফ : ১৫৯ আয়াত)

৫। এই মহা মহিমান্বিত রসূল (হে সমগ্র মানবকূল !) তোমাদের মধ্য হইতে তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন ; যাহা তোমাদের জন্য পীড়াদায়ক ও ক্ষতিকর, তাহা তাহার একেবারেই অসহনীয় এবং তোমাদের প্রত্যেক উপকার ও কল্যাণের বিষয়ে তিনি অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ও লালায়ীত। মু'মিনদের ব্যাপারে তিনি রউফ ও রহীম—অত্যন্ত করুণাশীল ও দয়ালু।

(সূরা তওবা, ১২৮ আয়াত)

৬। (হে রসূল !) তোমাকে আমরা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

(সূরা আম্বিয়া, ১০৮ আয়াত)

৭। এই নবী মু'মিনদের প্রতি তাহাদের নিজেদের প্রাণের চাইতেও বেশী স্নেহশীল এবং তাহার স্ত্রীগণ তাহাদের মাতা (স্বরূপ)—(পক্ষান্তরে তিনি তাহাদের স্নেহময় আধ্যাত্মিক পিতা স্বরূপ)। (সূরা আহযাব, ৭ আয়াত)

৮। নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে তাহার জন্য, যে আল্লাহ্‌ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে অধিক পরিমাণে।

(সূরা আহযাব : ২২ আয়াত)

৯। মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসূল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্‌ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী। (সূরা আহযাব : ৪১ আয়াত)

১০। হে নবী ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষী এবং সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী রূপে এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী এবং দীপ্তিমান প্রদীপ স্বরূপ। সুতরাং তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবধারিত আছে মহা কল্যাণ। (সূরা আহযাব : ৪৬-৪৮ আয়াত)

১১। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ এই নবীর উপর রহমত নাযিল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণও তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে, হে মু'মিনগণ ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং যথাযথভাবে সালাম পাঠাও। (সূরা আহযাব : ৫৭ আয়াত)

১২। এবং আমরা তোমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যই সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা জানে না। (সূরা সাবা : ২৯ আয়াত)

১৩। (হে রসূল!) তোমাকে আমরা সকল মানবের আদর্শ রূপে গ্রহণ কারীদের জন্য সুসংবাদদাতা রূপে এবং অস্বীকারকারীদের জন্য সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করিয়াছি; যাহাতে তোমরা আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসূলের উপর ঈমান আন, তাঁহার রসূলের সহায়ক হও, তাঁহাকে সম্মান এবং ভক্তি কর এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা কর, নিশ্চয় তাহারা তোমার (হে রসূল!) বয়'আত (দীক্ষ) গ্রহণ করে, তাহারা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌র নিকট বয়'আত করে; আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হস্তের উপরে, (সূরা ফাত্‌হ : ৮—১১ আয়াত)

১৪। মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রসূল, এবং যাহারা তাহার সংগে আছে, তাহারা কাফিরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্ত কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত, তুমি তাহাদিগকে রুকু' ও সিজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে, সিজ্‌দার চিহ্নের দরুন তাহাদের চেহারায় তাহাদের লক্ষণাবলী রহিয়াছে, তাহাদের এই বিবরণ তাওরাতে বর্ণিত আছে এবং ইন্‌জীলেও তাহাদের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা এক শস্য ক্ষেত্রের ন্যায় যাহা নিজ অঙ্কুর নির্গত করে, অতঃপর উহাকে সুদৃঢ় করে, ফলে উহা আরও পুষ্ট হয়, অতঃপর উহা স্বীয় কাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যাহা কৃষককে বিস্মিত করে, যেন তিনি তাহাদের (মু'মিনদের) উন্নতি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা বৃদ্ধি করেন, কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা ঈমান আনে এবং পুণ্যকর্ম করে আল্লাহ্‌ তাহাদের সংগে ক্ষমা এবং মহা প্রতিদানের অংগীকার করিয়াছেন। (সূরা আল ফাত্‌হ : ৩০ আয়াত)

১৫। এবং নিশ্চয় তোমার জন্য অশেষ পুরস্কার নির্ধারিত আছে এবং নিশ্চয় তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত আছ। (সূরা আল কালাম : ৪-৫ আয়াত)

১৬। এই রসূল কোন কথাই প্রবৃত্তির তাড়নায় বলেন না। বরং তাহার সকল কথা ও কাজ আল্লাহ্‌র ওহী অনুসারে। .....তেমনিভাবে তিনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে যোজক ও শাফা'আতকারী স্বরূপ। যেভাবে দুইটি ধনুকের তার মিলিত হইলে পরস্পর একত্রিত হয়, তেমনিভাবে উলুহিয়ত ও ইনসানিয়তের ধনুক দ্বয়ের উভয় তারের সম্মিলনের সরল রেখা ও স্বরূপ তিনি—তাহাদের উভয়ের পরস্পর সম্পর্ক ও সংযোগের উপায় স্বরূপ তিনি (ভাবার্থ)
(সূরা নযম : ৪-১০ আয়াত)

হাদীসের আলোকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

(১) হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেন, আমি মানবীয় চারিত্রিক গুণাবলীর পূর্ণ বিকাশের জন্য আবির্ভূত হইয়াছি। (মিশকাত)

(২) হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) এর চরিত্র ছিল কুরআন। (মুসলিম)

(৩) হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলিয়াছেন, ছয়টি বিষয়ে আমাকে অপরাপর নবীগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে :

(ক) সারিক তত্বপূর্ণ বাণী সমূহ আমাকে দেওয়া হইয়াছে।
(খ) প্রতাপ ও প্রভাবশক্তি দ্বারা আমি সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছি।
(গ) আমার জন্য গণিমতের মাল হালাল করা হইয়াছে।
(ঘ) সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ স্বরূপ পবিত্র করা হইয়াছে।
(ঙ) সমগ্র মানব কুলের প্রতি আমি প্রেরিত হইয়াছি।
(চ) আমাকে নবীগণের (মোহর) করা হইয়াছে। (মুসলিম)

(৪) আমি আল্লাহ্‌তা'লার নিকট তখন হইতেই খাতামান নাবীঈন ছিলাম, যখন হযরত আদম (আঃ) পানি ও কর্দমে মিশ্রিত অবস্থায় ছিলেন। (মুসনাদ আহ্‌মদ, কনযুল উম্মাল)

(৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন্ যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) সমস্ত মানবের মধ্যে সবচাইতে বেশী দানশীল ছিলেন। যখন রমযান মাসে জীব্রাইল (আঃ) কুরআন শরীফ পুনরাবৃত্তির জন্য তাঁহার নিকট আসিতেন, তখন তিনি পূর্বাপেক্ষাও অধিক দানশীলতার পরিচয় দিতেন, বরং ইহা বলা চলে যে, তিনি কল্যাণ ও দানশীলতায় মুষলধারায় বৃষ্টি ও উহার মধ্যকার প্রবল হাওয়া অপেক্ষাও প্রবলতর ছিলেন। (বুখারী)

(৬) হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের নেতা হইব। কবর হইতে নির্গমনকারীগণের মধ্যে প্রথম হইব এবং প্রথম শাফা'আতকারী ও যাহার শাফা'আত প্রথম গ্রহণ করা হইবে সে আমি। (মুসলিম)

(৭) হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন—আমার এবং অন্য নবীগণের দৃষ্টান্ত এই দৃষ্টান্তের অনুরূপ যে একটি উত্তম ও খুবই সুন্দর প্রাসাদের ন্যায় যাহা সম্পূর্ণ হইবার পর একটি ইট বসানোর জায়গা খালি রাখা হইয়াছে। দর্শকরা যখন আসে তাহারা প্রাসাদের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, কিন্তু যখন প্রাসাদে

একটি ইট রাখার জায়গা খালি দেখে তখন তাহারা স্তম্ভিত হয়। আমি সেই প্রাসাদের খালি জায়গার ইটের ন্যায়, যে ঐ জায়গাটিকে পূর্ণ করিয়াছে। সুতরাং নির্মাণ কাজ আমার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। (বোখারী)

(৮) হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন —আমাকে পরিপূর্ণ সুগভীর ঐশীবাণী দান করা হইয়াছে এবং আমাকে প্রতাপের সহিত সাহায্য করা হইয়াছে এবং আমি দেখিতে পাইলাম পৃথিবীর সম্পদের চাবি আমার হস্তে দান করা হইয়াছে। (মুত্তাফিকুন আলাইহে)

(৯) হযরত আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একদা রসূল করীম (সাঃ) মিম্বরে উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কে? তাহারা উত্তর দিল আপনি আল্লাহ্‌র রসূল! তিনি বলিলেন, আমি মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্ বিন আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ্ আমাকে সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠতম হিসাবে মনোনীত করিয়াছেন, অতঃপর তিনি সৃষ্টিকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং আমাকে উত্তম শ্রেণীত মনোনীত করিয়াছেন। অতঃপর তিনি গোত্র সৃষ্টি করিলেন এবং আমাকে উহার মধ্যে উত্তম গোত্রে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি পরিবার সমূহ সৃষ্টি করিলেন এবং আমাকে উত্তম পরিবারের মধ্যে প্রেরণ করিলেন। আমি তাহাদের মধ্যে উত্তম সদস্য এবং উত্তম পরিবার স্বরূপ। (তিরমিযী)

(১০) হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিলেন যে, "আমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট হইতে মর্যাদা প্রার্থনা কর।" তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রসূল কোন মর্যাদা?" তিনি বলিলেন "বিহিশ্‌তের সর্বোচ্চ মর্যাদা যাহা শুধু মাত্র একজন ছাড়া কেহই পাইবে না। হয়তো বা আমি-ই সেই ব্যক্তি। (তিরমিযী)

সংকলনে—মাওলানা সালেহ্ আহমদ

"সেই ব্যক্তি বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাঁহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা এখনও করিবেন।" ['আমাদের শিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

মুক্বামে মুহাম্মাদ (সাঃ)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌-মাওউদ (আঃ)-এর দৃষ্টিতে ঃ

মুহাম্মাদ শব্দের অর্থ, অতীব প্রশংসিত। শব্দটি ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে যে, এই উম্মতের মধ্যে একজন আহ্‌মদ—অতীব প্রশংসাকারী ব্যক্তিও জন্মগ্রহণ করিবেন, যেমন হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ يواطئ اسمه اسمي যে, তাহার নাম আমার নামের মত হইবে (তিরমিযী, আবুদাউদ)।

যে আহমদ আল্লাহ্‌তা'লার পরে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাধিক প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করিবেন, তাঁহার সর্বাধিক প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করা এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ জগদ্বাসীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা কেবল সেই আহ্‌মদের জন্যই অবধারিত ছিল। গত ১৪০০ বৎসরের মধ্যে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অগণিত প্রশংসাকারী এবং ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদনকারী হইয়াছেন; কিন্তু যুগ-ইমাম হযরত আহমদ আলাইহেস সালাম যেরূপে এই কামিল পুরুষ রহমাতুল্লিল আলামীনের সর্বোচ্চ শান ও মুকাম এবং উৎকৃষ্টতম চরিত্র ও গুণাবলীর প্রভূত প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন, উহার কোন তুলনা নাই। তিনি তাঁহার উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষায় প্রণীত পদ্য ও গদ্যের ৮৮টি ছোট বড় প্রত্যেকটি কিতাবেই আল্লাহ্‌তা'লার মযহারে কামিল—আল্লাহ্‌তা'লার গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উচ্চ শান ও মুকাম এবং প্রশংসা ও গুণকীর্তন করিয়া গিয়াছেন এবং অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে ইশ্‌ক ও মহব্বতে মাখা এমন শ্রদ্ধা-ভক্তি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন যেন তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন। এস্থলে কেবল দুই চারিটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল :

১। محمد است امام و چراغ هر دو جهان - محمد است فروزنده زمین و زمان
خدا نگویمش از ترس حق مگر بخدا - خدا نما ست وجودش برائے عالمیان

অর্থাৎ মুহাম্মাদ দুই জাহানের ইমাম ও প্রদীপ,
মুহাম্মাদ যমীন ও যমানার উজ্জ্বল দীপ্তি।
খোদার ভয়ে আমি তাঁহাকে খোদা বলি না, কিন্তু
খোদার কসম! তাঁহার সত্তা জগদ্বাসীর জন্য খোদা
দর্শনের দর্পণ স্বরূপ।

২। يا عين فيض الله والعرفان - يسعى اليك الخلق كالظمآن

অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র কল্যাণ ও জ্ঞানের ঝরণা!
পিপাসু ব্যক্তির ন্যায় লোক তোমার দিকে ছুটিয়া
আসিতেছে।

يا بحر فضل المنعم المنان - تهوى اليك الزمر بالكيزان

হে পরম দয়াল ও দানশীলের (খোদার) দানের সাগর! লোক পিয়ালা লইয়া দলে দলে তোমার নিকট আসিতেছে।

يا شمس ملك الحسن - نورت وجه البر و العمران

হে সৌন্দর্য ও অনুগ্রহ রাজ্যের সূর্য! তুমি জনহীন অঞ্চল এবং জনবসতির চেহারাকে উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছ।

৩। "কুরআন শরীফে হযরত খাতামুল আম্‌বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের যে উত্তম চরিত্র উল্লেখিত হইয়াছে উহা হযরত মূসা অপেক্ষা সহস্র গুণে উত্তম, কারণ আল্লাহতা'লা ইরশাদ করিয়াছেন যে, হযরত খাতামুল আম্‌বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে সেই সব উত্তম চরিত্রগুণ একত্রিত হইয়াছে যেগুলি বিভিন্ন নবীর মধ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। আল্লাহ্‌তা'লা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে ইরশাদ করিয়াছেন انك لعلى خلق عظيم যে, তুমি অতীব মহান চরিত্রের উপর দণ্ডায়মান আছ। "عظيم" শব্দটি দ্বারা যখন কোন বস্তুর তা'রীফ করা হয় তখন আরবী বাগ্‌ধারায় উহা দ্বারা ঐ বস্তুর চরম ও পরম কামালীয়ৎ (পূর্ণতা) বুঝায়। মানবাত্মার মধ্যে যত উত্তম চারিত্রিকগুণ এবং মধুর আচরণ বিদ্যমান থাকা সম্ভব ঐ সব চারিত্রিকগুণ পূর্ণ মাত্রায় মুহাম্মদী আত্মার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার এই তা'রীফ এত উচ্চাঙ্গের যে ইহার অধিক তা'রীফ সম্ভবই নহে। ইহার প্রতিই ইঙ্গিত করার জন্য অন্যত্র আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে وكان فضل الله عليك عظيما যে, তোমার উপর আল্লাহ্‌র সর্বাধিক ফযল রহিয়াছে; কোন নবীর পক্ষে তোমার ন্যায় মর্যাদা অর্জন সম্ভব নহে। এই তা'রীফই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের শান ও মুকাম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ গীতসংহিতা (যবূর কিতাবে) ৪৫তম অধ্যায়ে উল্লেখিত আছে "এই কারণ ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে।" (বরাহীনে আহ্‌মদীয়া)

৪। খোদাতা'লা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জীবনকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রথম অংশ দুঃখ, বিপদাবলীর ও ক্লেশের এবং দ্বিতীয় অংশ শক্তি ও বিজয় লাভের, যেন বিপদের সময় সেই সব চারিত্রিকগুণ প্রকাশ পায় যাহা কেবল বিপদের সময়েই প্রকাশ পাইয়া থাকে; এবং শক্তি ও বিজয় লাভের সময় সেই সব গুণ প্রকাশ পায় যাহা শক্তি ও বিজয় লাভ না করিলে প্রকাশ পাইতে পারে না। সুতরাং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের এইরূপ দুই প্রকারের যুগ ও অবস্থার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হওয়ার ফলে উভয় প্রকারের চারিত্রিকগুণ পূর্ণরূপে প্রকৃষ্ট হইল।

বিপদাবলীর যুগ যাহা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর তের বৎসর পর্যন্ত মক্কা মুয়ায্যমায় অতিবাহিত হইল সেই যুগের জীবনী পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম, এমন চারিত্রিকগুণ প্রদর্শন করিলেন যাহা বিপদাবলীর সময় পরম সত্যবাদীকে প্রদর্শন করা উচিত যেমন, খোদার উপর ভরসা করা, অধৈর্য ও অস্থির না হওয়া, দায়িত্ব পালনে শিথিল না হওয়া এবং কাহাকেও ভয় না করা। কাফিরগণ এইরূপ ইস্‌তেকামাত (স্থিতিশীলতা) দেখিয়া ঈমান আনিল এবং সাক্ষ্য দিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি খোদার উপর পূর্ণ ভরসা করিবে, এইরূপ ইস্‌তেকামাত প্রদর্শন এবং এত নির্যাতন বরণ করিতে পারে না।

অতঃপর যখন দ্বিতীয় যুগ আসিল অর্থাৎ বিজয় ও ক্ষমতা এবং ধনসম্পদের যুগ, তখন সেই সময়েও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মার্জনা, দানশীলতা এবং বীরত্বের মহান চারিত্রিগুণ এমন পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইল যে কাফিরদের এক বিরাট দল এইসব চারিত্রিকগুণ লক্ষ্য করিয়া ঈমান আনিল।.....বহু লোক তাঁহার এই চারিত্রিকগুণ দেখিয়া সাক্ষ্য দিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন ব্যক্তি খোদা কর্তৃক আদিষ্ট হয় এবং প্রকৃত সত্যবাদী হয় এইরূপ চারিত্রিকগুণ কখনও প্রদর্শন করিতে পারে না। (ইসলামী নীতিদর্শন)

৫। আধ্যাত্মিক জীবন দানের ক্ষেত্রে কিয়ামত সদৃশ নমুনা সকল গুণের অধিকারী সেই ব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যাহার মুবারক নাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। সম্পূর্ণ কুরআন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত এই সাক্ষ্য বহণ করিতেছে যে, এই রসূল সেই সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন যখন সকল জাতি দুনিয়াদারীতে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিক বিপর্যয় জলে ও স্থলে বসবাসকারীদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই সময় এই রসূল আসিয়া নূতনভাবে দুনিয়াকে জীবন দান করিলেন, এবং পৃথিবীতে তৌহীদের দরিয়া প্রবাহিত করিল। ন্যায় বিচারকগণ চিন্তা করুন যে আরবের দ্বীপে বসবাস কারী লোক পূর্বে কি ছিল এবং এই রসূলের অনুকরণ করিবার পর কি হইয়াছে? তাহাদের পশু-সদৃশ অবস্থা শ্রেষ্ঠ মানবের মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে; কেমন সত্যতা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহারা নিজেদের ঈমানকে সাচ্চা প্রমাণিত করিয়াছেন তাহাদের রক্ত প্রবাহিত করিয়া প্রাণ কুরবান করিয়া, স্বজনগণকে পরিত্যাগ করিয়া এবং তাঁহাদের ধন সম্পদ, মান সম্মান ও আরাম আয়াসকে আল্লাহ্‌র পথে নিয়োজিত করিয়া। বস্তুতঃ দুনিয়াতে একজনই কামিল ইনসান আবির্ভূত হইয়াছেন যিনি সর্বোত্তম ভাবে এবং পূর্ণরূপে এক অপূর্ব রূহানী বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া দেখাইয়াছেন, যুগযুগান্তের মৃতগণ এবং সহস্র সহস্র বৎসরের গলিত অস্থিসমুহে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার আগমনে সমাধিসমুহ উন্মুক্ত হইল এবং পচা হাড়সমুহ নব জীবন লাভ করিল এবং তিনি প্রতীয়মান করিয়া দেখাইলেন যে, তিনিই হাশির—সমবেতকারী এবং তিনিই রূহানী কিয়ামত, এক জগৎ কবরসমুহ হইতে উঠিয়া তাঁহার কদমের উপর দাঁড়াইল (আইনায়ে কামালতে ইসলাম)।

৬। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ ইহাও যে, হযরতে মাম্‌দূহর (অর্থাৎ নবী করীম সাঃ) চিরস্থায়ী কল্যাণ সদা সর্বদা জারী রহিয়াছে; এই যুগেও যে ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে তাহাকে নিঃসন্দেহে কবর হইতে উত্থিত করা হয় এবং তাহাকে এক নতুন রূহানী জীবন দান করা হয় (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)।

৭। ভালরূপে স্মরণ রাখিও যে, ইসলাম সদা সর্বদা নিজ পবিত্র শিক্ষা, হেদায়াত নূর ও বরকত সমূহের মিষ্ট ফলাদি এবং অলৌকিক বিষয়াবলী দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অতি শান ও মর্যাদাসম্পন্ন নিদর্শনাবলী এবং চারিত্রিক গুণাবলীর প্রভাব ইহাকে বিস্তার দান করিয়াছে। সেই সকল নিদর্শন ও প্রভাব অতীতে শেষ হইয়া যায় নাই পরন্তু সদা এবং প্রত্যেক যুগে নিত্যনূতন নিদর্শনাবলী প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হইয়া আসিতেছে এই কারণেই আমি বলিতেছি; যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই একমাত্র যিন্দা নবী (লেক্‌চার লুধিয়ানা)।

আল্লাহ্‌তা'লা ক্বুরআনে ইরশাদ করিয়াছেঃ

قل ان كنتم تحبون الله فا تبعو نى يحببكم الله

যে, হে রসূল! তুমি তাহাদিগকে বল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, ইহার ফলে আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন (সূরা আলে ইমরান)।

এই ইরশাদে খোদাওন্দীর আলোতে সুস্পষ্টই বুঝা গেল যে, যে ব্যক্তি যত ইশ্‌ক ও ও মহব্বত এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত মানব জাতির একমাত্র মুক্তি দাতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করিবে ততই সে আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও নৈকট্য অর্জন করিবে। যুগ-ইমাম হযরত আহমদ আলাইহেসসালাম যেরূপে তাঁহার আকা ও প্রভুর শান ও মুকাম এবং সৌন্দর্য ও কামালিয়তকে উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তেমনই ভাবে তিনি তাঁহার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক ইশ্‌ক ও মহব্বত এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে এবং তাঁহার অনুসরণে আত্মবিলীন হইয়াছিলেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা গেলঃ

১। بعد از خدا بعشق محمد مخرم - گر كفر ايى بود بخدا سخت كافرم

আল্লাহ্‌তা'লার পরে মুহাম্মদের প্রেমে আমি বিভোর; ইহা যদি কুফর মনে করা হয় তাহা হইলে খোদার কসম! আমি বড় শক্ত কাফির। (ফারসী দুর্‌রে সামীন)

২। يا حب انك قد دخلت محبة - فى مهجتى و مداركى و جنانى

ওহে প্রিয়! তোমার মহব্বত আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে, আমার সকল ইন্দ্রিয়ে এবং আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। (আরবী দুর্‌রে সামীন)

৩। من ذكر وجهك ياحد يقة - بهجتى - لم اخل فى لحظ ولا فى ان

ওহে, আমার সুন্দর পুষ্প-শোভিত আনন্দোদ্যান! তোমার মুখমণ্ডলের স্মৃতি হইতে আমার জীবনের কোন মুহূর্ত শূন্য নহে। আরবী দুর্‌রে সামীন

৪। جسمى يطير اليك من شوق علا - يا ليت كانت قوة الطيران

পরম আগ্রহের তাড়নায় আমার দেহ তোমার পানে উড়িয়া যাইতে চাহে, হায়! যদি আমার শক্তি থাকিত। (আরবী দুর্‌রে সামীন)

৫। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালামের জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্যা সুলতান আহ্‌মদ সাহেব এক্‌সট্রা এসিটেন্ট কমিশনার যিনি একজন বড় কবি এবং সাহিত্যিকও ছিলেন এবং হুযূর (আঃ)-এর জীবদ্দশায় বয়'আত করেন নাই, তিনি ঘরে যাহা কিছু দেখিয়াছেন এবং হুযূর (আঃ)-এর মধ্যে নিকট হইতে যাহা কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন উহার ভিত্তিতে বলিয়াছেন :

> "একটি বিষয় যাহা আমি পিতা মহোদয়ের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি উহা এই যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণ কথাও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। যদি কোন ব্যক্তি আঁ-হযরতের (সাঃ) শানের বিরুদ্ধে সামান্যতম কথাও বলিত, পিতা মহোদয়ের চেহারা রক্তবর্ণ হইয়া যাইত এবং ক্রোধে তাঁহার চক্ষু বিবর্ণ হইয়া যাইত এবং তৎক্ষণাত সেই মজলিস তিনি হইতে উঠিয়া পড়িতেন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সঙ্গে পিতা মোহতারমের এত ইশ্‌ক ছিল—এত ইশ্‌ক ছিল যে তাহা আমি কোন মানুষের মধ্যে দেখি নাই।
>
> (সীরাতুল মাহ্‌দী-২১৯ পৃঃ)

৬। একবার হযরত আকদাস ঘরেই ছিলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব হজ্জের উল্লেখ করিলেন এবং বলিলেন এখন তো যাতায়াতের অনেক সুযোগ সুবিধা হইয়া গিয়াছে ; হজ্জে যাওয়া উচিত। যখন হযরত মীর সাহেব ইহা উল্লেখ করিতেছিলেন, তখন হযরত আকদসের চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল, তিনি আঙ্গুল দিয়া অশ্রু মুছিয়া বলিলেন :

> "কথা ঠিক বলিয়াছেন, আমাদেরও এইরূপই কামনা। কিন্তু আমি চিন্তা করি যে, আমি কি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাযার মুবারক দেখিবার সাহসও করিতে পারিব ? (দুর্‌রে মনসূর ; হযরত মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব প্রণীত ২৮ পৃঃ)

৭। "সকল বরকত হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।" (ইলহাম-হযরত আহমদ আঃ)

৮। "সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি—আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই নহি—প্রকৃত মীমাংসা ইহাই। (উর্দু দুররে সামীন)

৯। "যদি সেই প্রিয়ের গলিতে তলওয়ার চলে,
তবে আমি প্রথম ব্যক্তি যে সর্ব প্রথম প্রাণ দান করিব।" (ফার্সী দুররে সামীন)

১০। "কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার রোয হাশরে।
তব প্রশংসামুখর সরব গোরখানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে॥"
(আরবী দুররে সামীন)

১১। "স্মরণ রাখিও, প্রকৃত মুক্তি যে কেবল মৃত্যুর পরই প্রকাশ পায় এরূপ নহে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহজগতেই উহার আলো প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ সত্য এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার এবং তাঁহার সৃষ্ট জীবের মধ্যস্থ শাফা'আতকারী (যোজক) এবং আসমানের নীচে তাঁহার সমমর্যাদা বিশিষ্ট আর কোন রসূল নাই এবং কুরআনের সমতুল্য আর কোন কিতাব নাই। অন্য কোন মানবকেই খোদাতা'লা চিরকাল জীবিত রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার এই মনোনীত নবীকে তিনি চিরকাল জীবিত রাখিয়াছেন (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

১২। সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের জ্যোতিঃ যাহা মানব তথা পূর্ণ মানবকে দেওয়া হইয়াছে, উহা ফিরিশ্‌তাগণের মধ্যে ছিল না, তারকায় উহা ছিল না, উহা পদ্মরাগ মনি ও নীলকান্ত মনিতে ছিল না, চন্দ্রে উহা ছিল না, সূর্যে উহা ছিল না, উহা ভূপৃষ্ঠে, সমুদ্রে ও নদী সমূহে ছিল না, উহা পান্না, হীরক ও মতির মধ্যেও ছিল না, উহা পার্থিব ও নৈসর্গিক বস্তুতে ছিল না, উহা ছিল শুধু মানবের মধ্যে তথা পূর্ণ মানবের মধ্যে. পূর্ণ ও সর্বোচ্চ মহীয়ান ও গরীয়ান, আমাদের প্রভূ সৈয়্যেদুল আম্বিয়া সৈয়্যেদুল আহয়িয়া মুহাম্মাদে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মধ্যে
(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম)

১৩। যাহারা নিজদিগকে রসূল (সাঃ) এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিত এবং পরে খৃষ্টধর্মের পোষাক পরিয়া রসূল (সাঃ)-এর শত্রু হইয়া গিয়াছে, তাহারা এত অধিক কটু কথা ও মিথ্যা দুর্নামপূর্ণ পুস্তক হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে ছাপাইয়াছে এবং বিলি করিয়াছে যে, শুনিলে শরীর কাঁপিয়া যায়। তাহারা বহু মুর্খ লোককে বিভ্রান্ত করিয়াছে। আমার মনে তখন সবচাইতে বেশী কষ্ট হয় যখন আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শান ও মর্যাদার বিরুদ্ধে হাসি-বিদ্রূপ এবং হুযূরের সম্মানের উপর আক্রমণের কথা শুনি। খোদার কসম! যদি আমার সকল সন্তান-সন্ততিকে অতঃপর সন্তান সন্ততির সন্তান সন্ততিদিগকে আমার চোখের সামনে হত্যা করা হয় এবং তাহাদের হাত-পা কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহাদের চোখের পুত্‌লী বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং আমাকে প্রত্যেক বাসনা কামনা হইতে বঞ্চিত করিয়া

দেওয়া হয় তথাপি আমার সেই মনঃকষ্ট ও পীড়া হইত না যাহা আমার আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শানের বিরুদ্ধে কটু কথা ও অবমাননা করার ফলে হয়। হে আল্লাহ! আমাদের অবস্থার উপর রহম কর, এবং দেখ আমরা কোন পরীক্ষার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতেছি।" (আইনায়ে কামালাতে ইসলাম)

১৪। ১৯০৭ ইং নভেম্বরে লাহোরে আর্য সমাজের পক্ষ হইতে একটি সভার আয়োজন করা হইয়াছিল যাহাতে বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাদের আহ্বানে কাদিয়ান হইতে হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব, হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, শেখ য়া'কুব আলী সাহেব সম্পাদক "আলহাকাম", মুফতী মুহাম্মদ সাদিক সাহেব সম্পাদক "বদর", সেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর প্রবন্ধ মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব পাঠ করিয়াছিলেন। আর্য সমাজী বক্তারা প্রতিশ্রুতি লংঘন করিয়া নিজেদের বক্তৃতায় আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে শক্ত কটুকথা এবং অবমাননাজনক উক্তি করিল। যখন প্রতিনিধিদল ফিরিয়া হযরত আকদাসের নিকট সভার বিবরণী পেশ করিলেন এবং উহাতে ইহা উল্লেখ করিলেন যে তাহারা প্রতিশ্রুতি লংঘন করিয়া এইরূপে কটুকথা বলিয়াছে, তখন হুযূর বলিলেন, "এই অবস্থায় তো আপনাদিগকে ওখানে এক মিনিটও বসা উচিৎ ছিল না, যে মুহূর্তে তাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাল্লামের শানের বিরুদ্ধে অবমাননা করিয়াছিল সেই মুহূর্তেই আপনাদিগকে দাঁড়াইয়া পড়া উচিত ছিল এবং হল হইতে বাহির হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, যদি তাহারা আপনাদিগকে বাহির হওয়ার পথ না দিত, তাহা হইলে রক্তে হল ভরিয়া যাওয়া উচিত ছিল। আপনারা আত্মমর্যাদা বোধকে এইরূপে ক্ষুণ্ণ করিলেন কেন, যে তাহারা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে গালাগালি করিল আর আপনারা চুপ করিয়া সেইসব গালমন্দ শুনিলেন?

অতঃপর হুযূর বড় জোসের সহিত সূরা নিসার এই আয়াত (১৪০) পাঠ করিলেন:

اذا سمتم ايات الله يكفر بها و يستهزء بها فلا تقعدوا
معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره -

যে, যখন তোমরা শুন যে আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করা হইতেছে এবং উহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তোমরা তাহাদের সহিত বসিয়া থাকিও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা অন্য কথায় মগ্ন হয়।" (দুররে মনসূর, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব প্রণীত)

সংকলন—মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, সদর মুরব্বী।

হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ্‌ আওয়াল (রাঃ)-এর দৃষ্টিতেঃ

"নিঃসন্দেহে, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছিল তাহা সম্যক অনুধাবন ও আয়ত্ত করা মানবীয় ক্ষমতার ঊর্ধে। যেহেতু আল্লাহতা'লার একান্ত অনুগ্রহক্রমে আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে ভালবাসি এবং তাঁর মহিমা ও মাহাত্ম্যের জ্ঞানও আমাকে দান করা হইয়াছে সেহেতু যেসকল ঐশী অনুদানকে অনুমান ও আয়ত্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব না হইলেও সেগুলিকে আমি এইরূপে বুঝি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্মেরও পূর্বে তাঁহার পিতা মারা যান এবং তিনি মাত্র চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যখন তাঁহার মাতাও মারা যান। তাঁহার সাক্ষাৎ ভ্রাতাও কেহ ছিল না! সুতরাং এ প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে, "আ-লাম্‌ ইয়া-জিদ্‌কা ইয়াতীমান"— তিনি কি তোমাকে এতিমরূপে পান নাই? এই এতিমকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহতা'লা বলিয়াছেন, "ইন্না আ'তাইনাকাল কাওসার" —আমরা তোমাকে অনেক কিছু দান করিয়াছি। আল্লাহতা'লা তাঁহাকে 'খাতামান্নাবীঈন'—সকল জ্ঞান ও কল্যাণের আধার এবং সকল রাজত্বের অধিপতি করিয়াছেন। তাঁহার অন্যতম মহৎ গুণ ছিল যে যখনই ধন-সম্পদ যত অঢেলই হউক না কেন, তাঁহার নিকট আসিয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ মসজিদেই বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। আজেই চিন্তা করিয়া দেখুন, আল্লাহতা'লা কত কল্যাণের আধিক্য ও আতিশয্যে তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন!! তাঁহার নবুওয়াতের আওতা ও কল্যাণ প্রবাহ কিয়ামতকাল ব্যাপীও বিস্তৃত। এখন কোন নতুন শরীয়তধারী বা পুরাতন (স্বতন্ত্র ও স্বাধীন) নবী (তাঁহার কল্যাণ বর্ষী পূর্ণাঙ্গ চিরস্থায়ী নবুওয়াতের আওতাধীন ব্যতিরেকে) আসিতেই পারে না। এইরূপ বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা অন্য কোন নবুওয়াতে প্রদান করা হয় নাই। এই আধিক্য ও প্রাচুর্য তো হইল যুগ বা কালের দিক দিয়া এবং স্থান ও পাত্রের দিক দিয়া এই প্রাচুর্য (কাওসার) নির্দেশ করা হইয়াছে —'ইন্নি রসূলুল্লাহে ইলাইকুম জামীয়ান" আয়াতে, অর্থাৎ আমি সারা জাহানের রসূল উক্ত 'কাওসার' প্রদত্ত হইয়াছে স্থান ও পাত্রের দিক দিয়া। কেহই একথা বলিতে পারে না যে ইলাহী আহকামের ক্ষেত্রে তাঁহার নবুওয়াতের অনুবর্তিতা ও অধীনতার আবশ্যক নাই। কাহারও ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম নাই। এখন (তিনি ব্যতীত) এমন কোন 'খিযির' নাই, যিনি বলিতে পারেন যে, লান তাস্‌তাতীয়া মায়েইয়া সাবরান "(– অর্থাৎ, 'আমার সাথে পরিভ্রমণের ধৈর্য ও সামর্থ তোমার নাই') তিনিই (সকল নবীর গুণ ও মর্যাদার অধিকার হিসাবে) সেই মূসা, যাঁহার সান্নিধ্য ও আনুগত্য হইতে কেহই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হইতে পারে না। অন্য কথায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যিকার অনুবর্তিতা না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহতা'লার নৈকট্য লাভ করিতে পারে না। ঐশী গ্রন্থ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহাকে এরূপ পরিপূর্ণতা, সামগ্রিকতা ও অফুরন্ত প্রাচুর্য দান করা হইয়াছে যে "ফীহা কুতুবুন

কাইয়্যেমা"—সমগ্র বিশ্বের সুদৃঢ় কিতাব ও বিধান এবং সার্বিক সত্যসমূহ তাহাতে বিদ্যমান।"

মুকাম ও মর্যাদার চিরক্রমোন্নতির ক্ষেত্রে তাঁহাকে এরূপ 'কাওসার' দান করা হইয়াছে যে ইহা একটি নির্ঘাৎ সত্য যে "আদ-দাল্লু আলাল খাইরে কা-ফায়িলিহি"—(অর্থাৎ কোন পুণ্যের দিক নির্দেশ ও আহ্বানকারী যে পুণ্য পালনকারীর তুল্যই হইয়া থাকে)। এমতাবস্থায় দুনিয়া জাহানের সর্বপ্রকার পুণ্য-কর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। যখন বিনা ঐ যাবতীয় পুণ্যের দিক নির্দেশ ও আহ্বানকারী হইলেন প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), তখন সেগুলির পুণ্য ফল ও পুরস্কার (credit) তাঁহারই কর্মলিপিতে যোগ হইয়া তাঁহার মুকাম ও মর্যাদার কিরূপ চিরক্রমোন্নতির কারণ হইয়া চলিয়াছে।

কর্মফল ও পুরস্কারের প্রতি লক্ষ্য করুন। অনুচরবৃন্দ, বিজয় সম্ভার, জ্ঞান-তত্ত্ব, ব্যবহারিক সুনীতি ও সু অভ্যাসের ক্ষেত্রে কত রকমের যে 'কাওসার' তাঁহাকে দান করা হইয়াছে তাহাও অতুলনীয়। তাঁহাকে এমন সব অনুচর দান করা হয়, যাঁহাদের নাম লইয়া মানুষ হতভম্ভ হইয়া যায়। আবুবকর, উমর, উসমান, আলী (রিযওয়ানুল্লাহে আলাইহিম আজমাইন)-এর ন্যায় মনীষীগণ তাহাদের অন্যতম, আর তেমনি আব্বাসীয় ও বনী-উমাইয়াদের ন্যায় (অসংখ্য পুণ্যবান ও অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন) লোক এ পর্যায়ের লোকের সন্ধান বাছাই করিয়াও পাওয়া অসম্ভব। তাঁহারা ছিলেন এমন আত্মনিবেদিত ও আনুগত্যশীল যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে পানি সিঞ্চনের আদেশ দিতেন সেখানে তাঁহারা ছিলেন প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত। (বিজয় ক্ষেত্র স্বরূপ) আরব, ইরান, তুরস্ক, মিসর, সিরিয়া ও ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল ভূখণ্ড তাঁহাকে দান করা হইল—এ যে তোমাদেরই সব। প্রতাপ-প্রভাব ও ঐশ্বর্য তাঁহাকে এমনই প্রদান করা হইয়াছিল যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কোন দিকে যাত্রাভিযানের মনস্থ করিতেন তখন এক মাস ব্যাপী সফর সমান ব্যবধানে অবস্থিত নৃপতি ও সম্রাটদের হৃদকম্পন আরম্ভ হইয়া যাইত। আল্লাহ্‌তা'লা যখন দান করেন তখন এইভাবেই দান করিয়া থাকেন।

ইহা এক সুদীর্ঘ বিষয়বস্তু, যাহা এই স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্র ও শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত তাঁহাকে যে 'কাওসার' প্রদান করা হইয়াছে তাহার উপর পৃথক গ্রন্থ প্রণয়ন করা যায়।

তাঁহাকে প্রদত্ত বাতেনী (আধ্যাত্মিক জ্ঞান তত্ত্বের) ধনভাণ্ডারের অবস্থা এরূপ, যে, বিগত তের শত বৎসরের কথা তো আমি জানি না—নিজের কথাই বলিতে পারি। আজ প্রচলিত যাবতীয় ধর্মই আমি নিরীক্ষণ করিয়াছি। সেগুলিকে খুঁতিয়া খুঁতিয়া দেখিয়াছি—ক্বুরআন করীমের তিনটি মাত্র শব্দ ("ইন্না আ'তাইনা কাল কাওসার")-এতদ্বারাই আল্লাহতা'লার ফযলে আমি সেগুলিকে রদ করিবার ক্ষমতা রাখি।

আমি অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি যে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কিতাব (আল-ক্বুরআন) এবং তাঁহার আদর্শ ও পদ্ধতি যদি কাহারও নিকট থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সকল ভ্রান্ত ধর্ম ও ভাব ধারণা—সেগুলি ইসলামের বাহিরের হউক অথবা ভিতরের—সেগুলি তিষ্ঠিতে পারে না।" (খুতবাতুন-নূর ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৯—১৭১)

সংকলনে ঃ মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
(সদর মুরুব্বী)

আহ্‌মদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ, আল মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) এর দৃষ্টিতেঃ

ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে চিত্রশিল্পীরূপে গড়িতে চায়

আফসোস! সময়ের স্বল্পতা ও শারিরীক অসুস্থতার জন্য আমি রসূল করীম (সাঃ) এর আখলাকের পূর্ণ চিত্র অঙ্কন করিতে পারিলাম না। তবু যাহা হউক, যতটুকু আমি বর্ণনা করিয়াছি, তাহাই যদি আমরা অনুকরণ করিতে আরম্ভ করি এবং ঐ সকল চারিত্রিক গুণাবলীকে নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিতে সচেষ্ট হই তবে সেইগুলির অনুকরণে সম্ভবতঃ শতাব্দীর পর শতাব্দী লাগিয়া যাইবে। কিন্তু আমি যেইরূপ বর্ণনা করিয়াছি তদনুযায়ী ঐ সমুদয় গুণাবলীর অনুকরণ ব্যতীত আমরা কখনও দুনিয়াতে সফলতা অর্জন করিতে পারিব না। মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এই চিত্র যাহা আমি অঙ্কন করিয়াছি এবং ঐ সকল গুণাবলী যাহা আমি বর্ণনা করি নাই, যে পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকে ঐগুলি হৃদয়ে অঙ্কিত না করিবে এবং যে পর্যন্ত না আমাদের প্রত্যেকে এক একজন ছোট ছোট মুহাম্মদ না হইতে পারিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কখনও খোদাতা'লার সন্তোষভাজন হইতে পারিব না।

লোকে বলে—ইসলাম ছবি অঙ্কন নিষেধ করিয়া শিল্পের ক্ষতি সাধন করিয়াছে। সেই অর্বাচীন ইহা জানে না যে ইসলাম তো প্রতিটি মুসলমানকে শিল্পী করে। ইসলাম ছবি তৈরী করিতে বাধা দেয় না বরং মামুলী ও অলাভজনক ছবি তৈরী করিতে নিষেধ করে এবং সেই ছবি তৈরী করিবার আদেশ দেয় যাহা এই দুনিয়াতেও মানুষের জন্য প্রয়োজন এবং পরকালেও মানুষের উপকারে আসিবে।

লোকে যখন ছবি আঁকে তখন কি করে? তুলি দিয়া কখনও কুকুর, কখনও বা গাধার ছবি আঁকে আর ইহাতে খুশী হয় যে তাহারা কুকুর বা গাধার ছবি আঁকিতে পারিয়াছে। কিন্তু ইসলাম এই কথা বলে যে—হে মুসলমানগণ! তোমরা প্রত্যেকে রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যা, শৈশবে, যৌবনে এবং বার্দ্ধক্যে জ্ঞান ও বুদ্ধির তুলি লইয়া মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছবি আঁকিতে থাক, ইহাই আমাদের কামনার ছবি।

সুতরাং এই ছবিটি অঙ্কন কর এবং বারবার অঙ্কন কর যাহাতে তুমিও 'মুহাম্মাদ' হইয়া যাও। যেহেতু মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের ছবি, এই কারণেই যখন তুমি 'মুহাম্মাদ' হইয়া যাইবে তখন মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ন্যায় তুমিও আমার (ইসলামের) সান্নিধ্যে আসিয়া যাইবে। অতএব, প্রত্যেক মুসলমানই একজন শিল্পী, প্রত্যেক মুসলমানই একজন চিত্রশিল্পী। কিন্তু যে ঐ মূল্যবান জিনিষের ছবি অঙ্কণ করে যাহা দুনিয়ার জন্যও মঙ্গল-জনক ও আখেরাতের জন্যও সে বাজে জিনিষ অঙ্কন করে না যাহা অপেক্ষা উত্তম

ছবি প্রকৃতি পূর্বেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে। পক্ষান্তরে ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে আদেশ দেয় যে—এলাহী জালওয়াহ্ (আল্লাহ্'র দীপ্তি) মুহাম্মদ (সাঃ) এর অন্তরে আপতিত হইতেছে, তিনি (সাঃ) খোদাতা'লার নৈকট্য লাভ করিয়া তাঁহার ছবি নিজের অন্তরে আঁকিয়া নিয়াছেন। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের খোদাতা'লার এইরূপ নৈকট্য লাভের যোগ্যতা নাই। এই জন্য তোমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর অন্তরের ছবি নিজেদের হৃদয়ে অঙ্কিত কর। এই ভাবে আসল (ছবি) দেখিতে না পাইলেও তাঁহার (মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাঃ) ছবি হইতে তোমরা আরও একটি ছবি আঁকিতে পারিবে।

মোটকথা, সকল মানুষই মুহাম্মদী (সাঃ) ছবি হইতে জামালে ইলাহী (আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য) এর ছবি অঙ্কণের যোগ্যতা রাখে। শুধু সাহসের প্রয়োজন ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। নতুবা পথ খোলা রহিয়াছে এবং তাহা হামেশা খোলা থাকিবে।

বন্ধুগণের প্রতি একটি মূল্যবান উপদেশ ঃ

আমি বন্ধুগণকে উপদেশ দিতেছি, আপনারা নিজেদের মধ্যে এই বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টি করুন যে, যখনই কোন কাজ করিবেন তাহা এই উদ্দেশ্যে করিবেন না যে অমুকে যথা—আল্লাহ্ দিত্তা, আবদুল্লাহ বা শুকুরুল্লাহ্ এই কাজ করিতেছে, বরং যখনই কোন কাজ করিবেন তখন চিন্তা করিবেন ও ভাবিয়া দেখিবেন যে, যদি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জায়গায় হইতেন তখন কি তিনি এইরূপ কাজ করিতেন যাহা আমি করিতেছি? বস্তুতঃ খোদা আমাদের নিকট হইতে কি প্রত্যাশা করেন? তিনি আমাদের নিকট ইহাই চান যে—আমরা যেন মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আখলাক ও তাঁহার অভ্যাস পূর্ণ-রূপে অনুকরণ করি এবং সেই কাজই করি যাহা তিনি করিয়াছেন।

অতএব, প্রত্যেক কাজ করিবার সময় নিজের মনকে এই প্রশ্ন করিবে যে, আমি যাহা কিছু করিতেছি তাহা কি রসূলে করীম (সাঃ) এর শিক্ষা এবং তাঁহার আদর্শের অনুরূপ? যদি এই সময় আমার স্থলে রসূলে করীম (সাঃ) হইতেন তবে তিনি কি এই কাজ করিতেন? তখন নিজেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মনে নিজের কাজের প্রতি কত অনুতাপ ও লজ্জার সৃষ্টি হয়। কেহ তোমাকে কোন কথা বলিলে রাগে তুমি তাহাকে তাহার মা-বোন তুলিয়া গালি দিয়া থাক, গালি দিবার সময় যদি তুমি ইহা চিন্তা কর যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যদি আমার জায়গায় হইতেন তাহা হইলে কি এই গালি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত? তখন নিশ্চয় তোমার মনে অনুতাপের সৃষ্টি হইবে এবং তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে যে, আমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মত নই। যদি আমি এই অবস্থায় মারা যাই তবে কিয়ামতের দিন মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লার নিকট ইহা বলিতে পারিবেন না যে এই ব্যক্তিও আমার অনুরূপ, তাহাকে বিহিশ্‌তে দাখিল করিয়া দেওয়া হউক।

অথবা তুমি দেখিতেছ যে একজন লোক অনাহারে মারা যাইতেছে আর তুমি তাহার দিকে কোন মনযোগ না দিয়া চুপ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আস। সেই সময় তোমার ইহা চিন্তা করা উচিত যে, যদি মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমার জায়গায় হইতেন তখন কি তিনি এই ভাবে চুপ করিয়া চলিয়া যাইতেন এবং ক্ষুধাতুরকে কোন সাহায্য করিতেন না?

সুতরাং তুমি নিজের যিন্দেগীতে ঐ সকল আমল করিবে যাহার আদর্শ মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। নিজেদের হৃদয়ে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছবি অঙ্কন করা ব্যতীত তোমাদের জন্য মুক্তির আর কোন পথ নাই। তাঁহারই (সাঃ) মত নিজেকে গড়িতে চেষ্টা কর। বর্তমান যামানায় তোমাদের জন্যতো আরও সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা যে ছবি বিলীন হইয়া গিয়াছিল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর মাধ্যমে খোদাতা'লা তাহা পুনরায় রওশন করিয়া দিয়াছেন। ক্ষয়ে যাওয়া ছবি হইতে নক্‌শা অঙ্কন করা মুশ্‌কীল, কিন্তু যদি ছবিতে পুনরায় রং লাগানো হয় তাহা হইলে চিত্র অঙ্কনে কোন অসুবিধা হয় না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আঃ এর একটি জীবন দায়িনী কীর্তিঃ

বর্তমান যমানায় মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর যে ছবি ঝাপ্‌সা হইয়া গিয়াছিল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) উহার উপর রং লাগাইয়া সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখনও যদি অবহেলা কর, এখনও যদি এই ছবিকে নিজের হৃদয়ে আঁকিতে চেষ্টা না কর এবং এখনও যদি ইহার অনুকরণ না কর তবে তাহা অতিশয় পাপ হইবে। খোদা আমাদের জন্য এক সহজ উপায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ ভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলিয়াছেন আল্লাহ্‌তা'লার মা'রেফাতের ঐ সমুদয় পেয়ালা যাহা অন্যদেরকে পান করানো হইয়াছে উহার সবগুলি পূর্ণ করিয়া আমাকে পান করানো হইয়াছে। সুতরাং যখন মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর প্রতিচ্ছবির (হযরত মসীহ্ মাওউদ আঃ) মধ্যে আমরা তাঁহার (সাঃ) ছবি দর্শন করিয়াছি, তখন আজ আমাদের জন্য কোনও বাহানার অবকাশ নাই। আজ এইরূপ কোনও সৃষ্টি অবশিষ্ট নাই যাহার নমুনা আমাদের সামনে অনুপস্থিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কুরআন শরীফের আদেশাবলীর ঐ সমুদয় ব্যাখ্যা বিস্তারিত ভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছেন যে সমুদয়ের উপর রসূল করীম (সাঃ) আমল করিয়াছেন।

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই সে পুরুষ হউক বা নারী হউক, যুবক হউক অথবা বৃদ্ধ হউক, শিশু হউক বা মধ্যবয়সী হউক—অবশ্য কর্তব্য যে, সে চিত্র শিল্পী হইবে এবং এইরূপ চিত্র শিল্পী হইবে যাহাতে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছবির অনুরূপ ছবি নিজের হৃদয় পটে অঙ্কন করিয়া নেয়।

মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাঃ এর রূহানী ছবি অঙ্কন করিলে খোদাতা'লার ছবি আমাদের মধ্যে আসিয়া যাইবেঃ

আমি বলিয়াছি যে, মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আকৃতির (ঐশী গুণাবলীর) অধিকাংশ যথাসম্ভব খোদার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। সুতরাং যখন আমরা মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ছবি নিজেদের হৃদয়ে আঁকিতে যত্নবান হইব, তখন যেহেতু মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছবি খোদাতা'লার ছবি, সেই জন্য খোদাতা'লার ছবি আমাদের মধ্যে আসিয়া যাইবে। এবং যখন খোদাতা'লার ছবি আমাদের মধ্যে আসিয়া যাইবে তখন আমাদের কোন ভয় থাকিবে না। আমাদের সামনে পদস্খলনের কোন অবস্থার উদ্ভব হইবে না। আমাদের বাসনা আপনা হইতেই পূর্ণ হইয়া যাইবে ও ভয়-ভীতি আপনাতেই দূর হইয়া যাইবে। কেন না খোদা এই সকল বিষয়ের উর্দ্ধে। তাঁহার নিকট না কোন ভয়-ভীতি আসিতে পারে এবং না তাঁহার এরাদা অপূর্ণ থাকিতে পারে। এই কারণেই মু'মিনদের সম্বন্ধে কুরআন করীমে আল্লাহ্'তালা বলিয়াছেন যে, জান্নাতে তাহারা যাহা কিছু চাহিবে, তাহারা তাহা লাভ করিবে। এই কথার ইহাই তাৎপর্য যে, খোদাতা'লার রঙে রঙীন হওয়া ও তাঁহার ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার ফলে তাহার অন্তরে যেই আকাঙ্খার সৃষ্টি হইবে তাহা পূর্ণ হইবার যোগ্য হইবে।

মহিলাগণের ইহা কর্তব্য, তাহারা যেন সর্বদা আপন সন্তানগণের হৃদয়ে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর রূহানী নক্সা অঙ্কন করিতে থাকেঃ

মহিলাদের মনযোগ বিশেষ ভাবে আমি এই বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতেছি যে, রসূল করীম (সাঃ) এর সব চাইতে অধিক অনুগ্রহ তাহাদের উপর রহিয়াছে। কেননা পৃথিবীর বুকে নারীদের চাইতে বেশী অবহেলিতা-নির্যাতিতা আর কোনও জাতি ছিল না। তাহাদিগকে তুচ্ছ ও ঘৃণিত মনে করা হইত এবং কোথাও তাহাদিগকে সম্মানের চোখে দেখা হইত না। রসূল করীম (সাঃ) এর নারী জাতির প্রতি এত বড় এহ্সান যে, তিনি তাহাদের সম্মান ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাহাদের আবেগ ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পুরুষদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন। এহ্সানের স্মৃতি-স্বরূপ

যাহা মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) তাহাদের উপর করিয়াছেন, তাহাদের ইহা অবশ্য কর্তব্য যে, তাহারা যেন অধিক হইতে অধিকতর তাঁহার আমল ও আখলাকের অনুকরণ করে এবং এই আমল আখলাকের নকসা আপন ছেলে-মেয়েদের অন্তরে সৃষ্টি করিতে চেষ্টারত থাকে। বস্তুতঃ আজিকার মানুষটি ঐ সকল চারিত্রিক গুণে প্রভাবান্বিত হয় যদ্দারা তাহাকে নয় দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গড়িয়া তোলা হয়, যে নয় দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মায়ের কোলে প্রতিপালিত হয় এবং তাহারই নিকট হইতে আখলাক ও অভ্যাস শিখিয়া থাকে।

অতএব, দুনিয়াতে মহিলাগণ উত্তম চিত্র-শিল্পী হইতে পারে যাহার কোলে তাহার শিশু লালিত পালিত হয় এবং যে শিশুর শৈশব কালেই তাহার হৃদয়ে যেরূপ ছবি আঁকিতে চায় তাহা আঁকিতে পারে।

সুতরাং তোমরা আপন সন্তান সন্ততির হৃদয়-পটে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর ছবি অঙ্কন কর যাহাতে বড় হইলে সে নূতন কোন ছবির প্রয়োজন অনুভব না করে, বরং তাহার বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথেই মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সেই ছবিও বড় হইতে থাকে যাহা তাহার মা তাহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল।

এতদ্‌ সঙ্গে আমি বয়স্কদের নিকটও আবেদন জানাইতেছি যে, আজ পর্যন্ত আপনাদের দ্বারা এই বিষয়ে যতটুকু শিথিলতা হইয়াছে তাহা দূর করিয়া ফেলুন এবং মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর চরিত্রে এইরূপ উত্তম পর্যায়ের নমুনা পেশ করুন যে জগদ্বাসী এই জগতে ইহা ছাড়া আর কোন কিছুই যেন দেখিতে না পায়, যেমন এক কবি বলিয়াছেন—

'যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু তুমিই তুমি' এইরূপে স্বভাবগুণে উন্নতি করিতে করিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে যে, কিছুকাল পরে আমরা যেদিকেই তাকাই 'মুহাম্মাদ' (সাঃ) ভিন্ন অন্য কেহই আমাদের দৃষ্টি গোচর হইবে না। যদিও সে ছোট মুহাম্মাদ (সাঃ) অথবা বড় মুহাম্মাদ (সাঃ) যাহাই হউক না কেন। আর ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন এই দুনিয়াতে মুহাম্মাদই (সাঃ) আমাদের দৃষ্টি গোচর হইতে থাকিবে তখন যেহেতু মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) খোদাতা'লার গুণাবলীর একটি ছবি, এইজন্য দুনিয়াতে পূর্ণ তওহীদ সৃষ্টি হইয়া যাইবে ও শির্‌ক বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, কেন না যেখানে একমাত্র খোদাই বিরাজমান থাকিবেন সেখানে শির্‌কের অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না।"

উস্‌ওয়ায়ে হাসনাহ্‌ পুস্তক হইতে
সংকলনেঃ
—মৌঃ ফজলুল করিম মোল্লা

হযরত হাফিয মির্যা নাসীর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাঃ)-এর দৃষ্টিতেঃ

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সর্বমুখী প্রজ্ঞা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশের জাতিগণের নিকট রসূলগণকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন রসূল (সাঃ) এমনই যে তাঁহাকে সমগ্র পৃথিবীর নিকট সকল সময়ের জন্য এবং সকল মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠানো হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও প্রেরিত হওয়ার দিক হইতে তাঁহার মধ্যে এবং অন্য রসূলগণের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

সুতরাং রিসালতের মর্যাদায় ফযিলতও আছে এবং রসূলরূপে প্রেরিত হওয়ার দিক হইতে কোন পার্থক্যও নাই! রসূল সম্পর্কিত বুনিয়াদি বিষয়াবলীর মধ্যে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত। হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-কে যদি কুরআন আযীম শুধু রসূল বলিত তবে রিসালত হিসাবে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিত না। হযরত ইয়াহিয়া (আঃ) এবং আঁ-হযরত (সাঃ) এর মধ্যে রসূল বা প্রেরিত হিসাবে কোনই প্রভেদ থাকিত না। যদিও ফযিলত যথাস্থানে থাকিত, তবু সেই দেদীপ্যমান ফযিলত যাহা সকল নবী হইতে তাঁহাকে পৃথক করে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতাম না। এইজন্য কুরআন করীম যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে রসূল বলিয়া রিসালতের মুকামে সকল নবীর সমান স্থানে দাঁড় করাইয়াছে তেমনি তাঁহাকে আর এক উচ্চ স্থান দিয়াছে যাহা সূরা আহযাবের ৪১ আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

সূরা আহযাবের ৪১ আয়াত অনুযায়ী আঁ-হযরত (সাঃ) রসূল ও খাতামাল আম্বিয়া উভয়ই। খাতামুল আম্বিয়া বা খাতামুল মুরসালীন খতমে নবুওয়াত বা খতমে রিসালতের মুকামকে ইসলামী পরিভাষায় মুকামে মুহাম্মদীয়ত বলা হয় এবং ইহাতে হযরত নবী আকরাম (সাঃ) অদ্বিতীয়। ইহা সেই ফযিলত নহে যাহা ফায্‌যালনা বাযাহুম আলা বায়ায বাণীতে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব হিসাবে বর্ণিত হইয়াছে। আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্বেও তুলনামূলকভাবে প্রথম ও শেষ আছে। যদি রিসালাত হিসাবে কোন প্রভেদ নাও থাকে এবং মানষচক্ষে সব নবী এক ময়দানে দাঁড়ান তবে বাম দিক হইতে দেখিলে ডান দিকে যিনি, তিনি শেষ এবং ডান দিক হইতে দেখিলে বাম কোনস্থ নবীই শেষ নবী। সুতরাং আপেক্ষিক বিচারে এই ধরনের এক প্রকার শেষ আছে। ইহাতে কোন ফযিলত নাই। ইহা একটি আপেক্ষিক বিষয় যে কোন্‌ হইতে দেখিবেন, সম্মুস্থ শেষ প্রান্তই শেষ বলিয়া মনে হইবে।

সুতরাং 'ফায্‌যালনা বা'যাহুম আলা বায়ায, যেমন একটি বুনিয়াদি হকিকত, তেমনই 'লা নুফাররিকু বাইনা আহাদিম মির রসূলিহী' ও নিজ স্থানে একটি মূল সত্য। বস্তুতঃ হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর যে স্থান—তাঁহার স্রষ্টা ও প্রভুর নিকট তাহা প্রকাশার্থে তাঁহাকে খাতামান্নাবীঈন বলা হইয়াছে। খাতামান্নাবীঈন অর্থাৎ মুহাম্মদীয়তের মুকাম পূর্ণতম ঐশী নৈকট্য

লাভের মুকাম। অন্য কথায় তিনি স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশস্থল। এই মর্য্যাদা শুধু আঁ-হযরত (সাঃ) লাভ করিয়াছেন, অন্য কোন নবী এই মর্যাদায় পৌঁছিতে পারেন নাই। বলা হয় যে, রিসালতের গণ্ডীর মধ্যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে আমরা যেন পার্থক্য না করি। কিন্তু মুহম্মদীয়াতের মুকামের দিক হইতে তিনি যে অদ্বিতীয় স্থানে অধিষ্ঠিত উহা স্রষ্টার গুণাবলীর পূর্ণতম প্রকাশের মুকাম। এই মুকামকে সব মানুষের তুলনায়—ইনসানে কামিল' বা পূর্ণতম মানুষ বলা হয়। নৈকট্য লাভের দিক দিয়া আল্লাহ্‌তা'লার অধিকতর নিকটবর্তী অন্য কেহ নাই, অন্য কোন ব্যক্তি খোদার প্রেম লাভে তাঁহার চাইতে অধিকতর নিকটবর্তী নহে এবং হইতেও পারে না।

আল্লাহতা'লা বলেন : রাফা'আ বা'আযাহুম দারাযাত অর্থাৎ তিনি কাহাকেও কাহাকেও উচ্চ মর্য্যাদা দিয়াছেন (সূরা বাকারাঃ ২৫৪ আয়াতে)। ইহার অর্থ হইল আল্লাহতা'লা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে রব্বে করীমের আরশ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রদান করিয়াছেন। ক্বুরআন করীমের প্রত্যেক আয়াত, বাক্য এবং শব্দের অনেক মর্ম আছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উপরোক্ত আয়াতের এক অর্থ করিয়াছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সেই রসূল যিনি তাঁহার মর্য্যাদার দিক দিয়া সব রসূলের উর্ধে এবং আধ্যাত্মিক উচ্চতায় অদ্বিতীয়, কোন রসূল এই মুকামে তাঁহার শরীক নহেন।

ক্বুরআন করীমের অন্যত্র আল্লাহতা'লা বলেন : "ইন্নাকা লায়া'লা খুলুকিন আযীম" অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লার গুণে গুণান্বিত হওয়ার মুকামে অন্য মানুষ দূরে যাউক, অন্য নবীও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিতে পারেন না, বরং কোন মানুষ তাঁহার মুকামের নিকটেও পৌঁছিতে পারে না। ইহা তাঁহার মুহাম্মদীয়াতের মুকাম। ইহাতে তিনি সব রসূল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ক্বুরআনে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার কালাম খোদার কালাম এবং তাঁহার প্রকাশ খোদার প্রকাশ এবং তাঁহার আগমন খোদার আগমন। খোদাতা'লা বলেন : "জা'আল হাক্বু ওয়া যাহাকাল বাতিল" (সুরা বনী ইসরাঈল : ৮২ আয়াত) অর্থাৎ সত্য বা 'হক্ব' আসিয়াছে, মিথ্যা দূরীভূত হইয়াছে। এই আয়াতে করীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে 'হক্ব' শব্দ দ্বারা আল্লাহতা'লা, ক্বুরআন আযীমের শেষ ও পূর্ণ শরী'আত হওয়া এবং হযরত মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এই তিনের প্রত্যেককেই বুঝায়।

মে'রাজের মাধ্যমে মুসলমান জাতি তথা পৃথিবীবাসীর নিকট এই চিত্র উপস্থাপিত হইয়াছে যে : তোমরা পার্থিব মুকাম হইতে উর্ধে দৃষ্টিপাত কর, প্রথম আকাশে তোমরা হযরত আদম (আঃ)-কে পাইবে, দ্বিতীয় আকাশে হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-কে দেখিবে, তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখিবে, চতুর্থ আকাশে হযরত ইদরীস (আঃ)-কে দেখিবে, পঞ্চম আকাশে হযরত হারূন (আঃ)-কে, ষষ্ঠ আকাশে শরী'আত দাতা নবী হযরত মূসা (আঃ)-কে এবং সপ্তম আকাশে গায়েব তশরীয়ী নবী হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখিতে

পাইবে। ইহারও উর্ধে আরশে-রব্বেকরীমে হযরত মুহাম্মাদ খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। অন্য কথায় মে'রাজের হক্কিকতের দিক দিয়া হযরত নবী আকরাম (সাঃ) এর মুকাম হইল আরশ-ই রব্বে-করীম ; ইহাও বলিতে পারি যে, সম্যক পূর্ণ সদগুণে গুণান্বিত খোদা তাঁহাকে মযহারই-আতাম-ই উলুহিয়ত (ইশ্বরত্বের পূর্ণতম প্রকাশ) রূপে সৃষ্টি করিয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন। মে'রাজের হক্কীকত বা মূলতত্ব রূপে রূপকের ভাষায় বর্ণিত ইহাই খতমে নওবুওয়াত।..... আঁ-হযরত (সাঃ) আরশের অধিপতি খোদাইযুল-আরশের ডান পার্শ্বে উপবিষ্ট। ইহা তাঁহার মুকামের দিক হইতে সেই প্রেমের ফল যাহার দ্বারা তাঁহাকে সমাদৃত করা হইয়াছিল। ইহাই সেই খতমে নবুওয়াত যাহা খোদাতা'লা তাঁহাকে দিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত চিত্রে এই মুকাম অর্থাৎ রব্ব-ই-করীমের আরশে স্থাপিত মুকাম-ই-মুহাম্মদীয়াত বা মুকাম-ই-খাতামুল মুরসালীন বা মুকাম-ই-খাতামান্নাবীঈন প্রকৃতপক্ষে এতই উচ্চ যে সেখানে অন্য কোন মানুষ পৌঁছিতে পারে না। ইহা সেই মুকাম এবং মুকাম-প্রাপ্ত ব্যক্তি যাঁহার জন্য সারা বিশ্বের সৃষ্টি। হাদীসে কুদসী 'লাও লাকা লামা খালাক্তুল আফ্‌লাকা অর্থাৎ তোমাকে সৃষ্টি না করিলে আকাশ সমূহ সৃজন করিতাম না" এই হক্কীকতই প্রকাশ করিতেছে। এই জন্যই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এই মুকাম সেই সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যখন হযরত আদম জন্মগ্রহণ করেন নাই। আঁ-হযরত সাঃ) সেই সময়েও খাতামান্নাবীঈন ছিলেন যখন আদম মৃত্তিকার মধ্যে পার্শ্ব পরিবর্তন করিতেছিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ মুকাম।

রিসালতের দিক হইতে তাঁহার মধ্যে এবং আদমের মধ্যে কোন প্রভেদ করা যায় না। কিন্তু তিনি শুধু একজন রসূলই নহেন, বরং খাতামান্নাবীঈনও। খাতামান্নাবীঈনের অত্যুচ্চ মুকামের দিক হইতে অন্য কোন নবী এই দাবী করিতে সাহস করিতে পারেন না। এ বিষয়ে আঁ-হযরত (সাঃ) অদ্বিতীয়। তাঁহার মুকাম মহামহিমান্বিত খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে—রব্বে করীমের আরশের উপর যাহাকে আমরা মুকামে মুহাম্মদীয়ত বলি। এই অর্থে তিনি আযীমুশশান আখেরী নবী। আমরা খোলা চোখে দিব্য দৃষ্টিতে যুক্তি প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে তাঁহার 'আখেরী নবী' হওয়াতে ঈমান রাখি। মুকামে মুহাম্মদীয়াত বা খতমে নযুওয়াতের মুকাম যাহা (সূরা আহ্‌যাবে বর্ণিত হইয়াছে) অদ্বিতীয় হওয়ার দিক দিয়া তিনি আখেরী নবী এবং খাতামান্নাবীঈন ও খাতামুল মুরসালীন।

সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁহার মুকামে মুহাম্মদীয়াতে অদ্বিতীয়। তিনি ঐ সময় হইতে আখেরী নবী, যখন আদমের নবুওয়াতের কথা দূরে থাকুক, তিনি জড় দেহও প্রাপ্ত হন নাই। বস্তুত সব নবুওয়াতই মুহাম্মদীয় নবুওয়াতের অধীনে লব্ধ। কারণ আল্লাহ্‌তা'লা এই নবুওয়াতের জন্য এবং এই মুকামে মুহাম্মদীয়াতের জন্য সারা জগত সৃষ্টি করিয়াছেন।"

জুমু'আর খুতবা হইতে

সংকলনে—মৌঃ এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর দৃষ্টিতে :

"সব চাইতে অধিক জ্যোতি কিসের আকারে তোমাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছে? মূর্তিমান জ্যোতি হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ওমা আনা আলাইকুম বেহাফিয" আমি হইলাম খোদার নূর, আমি হইলাম চক্ষু উন্মোচনকারী জ্যোতির ঐ উৎস এবং চক্ষু উন্মীলনকারী জ্যোতির ঐ পূর্ণতম বিকাশস্থল, যাহা তোমাদিগকে জ্যোতি দান করিয়াছে। উহা আমিই। আমি আসিয়া গিয়াছি। এখন যদি তোমরা চাও ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজেরাও জ্যোতি লাভ কর এবং জগদ্বাসীকেও জ্যোতি দান কর এবং যদি চাও তাহা হইলে ইহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্ধই থাকিয়া যাও।

আল্লাহ্তা'লা বলেন ঃ—

اتبع ما اوحى اليك من ربك ج لا اله الا هو ج اعرض عن المشركين - ولو شاء الله ما اشركوا ط وما جعلناك عليهم حفيظا ج وما انت عليهم بوكيل

(সূরা আল্ আন'আম, আয়াত ১০৭-১০৮)

তুমি লোকদিগকে খোদা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছ। কিন্তু খোদাপর্যন্ত পৌঁছার পর মানুষ পুনরায় শির্কে নিমজ্জিত হইবে। যখন তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তখন তাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদাকেও পরিত্যাগ করিবে। যখন তাহারা তোমার দিক হইতে মুখ ফিরাইবে তখন তাহারা এক ও অদ্বিতীয় খোদার দিক হইতেও মুখ ফিরাইবে এবং ইহার ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে আবার শির্ক ছড়াইয়া পড়িবে।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিবরণ দিতেছি। একদা একজন ইহুদী মহিলার ছেলে মৃত প্রায় হইল। উক্ত মহিলা এই কথা জানিত যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই ছেলেকে স্নেহ করিতেন। উক্ত ইহুদী মহিলা যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিল যে, আমার ছেলে মৃতপ্রায়, তাহাকে আপনি ভালবাসেন এবং আপনি যদি চাহেন যে তাহাকে একবার মৃত্যু শয্যায় দেখিয়া যাইবেন, তাহা হইলে এখানে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। আঁ-হযরত (সাঃ) মজলিসে বসিয়া ছিলেন। এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সরাসরি উক্ত ইহুদী মহিলার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ছেলে মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিল। তিনি তাহার পাশে বসিয়া পড়িলেন এবং স্বীয় সান্নিধ্য দ্বারা তাহাকে প্রশান্তি দান করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলে, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে না যে মুসলমান হইয়া প্রাণ দিবে?" সে মাথা

নাড়াইল, 'হাঁ, আমি ইহাই পছন্দ করিতেছি।' বস্তুতঃ সে কলেমা পড়িল এবং প্রাণ ত্যাগ করিল। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, ইহাতে আঁ-হযরত (সাঃ) এতই আন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, "আলহামদুলিল্লাহ্‌, আলহামদুলিল্লাহ্‌। খোদা আমাকে একটি আত্মাকে বাঁচানোর তওফিক দান করিয়াছেন।" যিনি সমগ্র বিশ্বের আত্মা-সমূহকে বাঁচাইতে আসিয়াছিলেন, যিনি আমাদের সকলের আত্মাকে বাঁচাইয়াছেন, যদি আমরা আমাদের বাপ-দাদা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সদা সর্বদা তাঁহার গোলামীতে অবনত থাকি, তথাপি আমরা তাঁহার এহ্‌সানের ঋণ শোধ করিতে পারিব না। ঐ পরিপূর্ণ নূর, যিনি মানব জাতিকে অন্ধকার হইতে বাহির করিলেন এবং জ্যোতি দান করিলেন, তিনি সমগ্র বিশ্বের হিতসাধনকারী ছিলেন এবং থাকিবেন; যাহার দুয়ারে এক দিন না একদিন সমগ্র মানবগোষ্ঠি অনিবার্যভাবে সমুপস্থিত হইবে এবং তাঁহার তওফিকে ও তাঁহার অসিলায় আল্লাহ্‌তা'লার আজ্ঞানুবর্তিতায় সত্য হেদায়াত লাভ করিবে, মাত্র একটি আত্মা, বাঁচিয়া যাওয়া এই মূর্তিমান রহমত রসূলে আকরাম (সাঃ) এর হৃদয়ের এই অবস্থা হইল এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই অবস্থা হইল যে, তিনি বার বার বলিলেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌, খোদা আমাকে একটি আত্মাকে বাঁচানোর তওফিক দান করিয়াছেন।

ইনিই হইলেন আমাদের আকা ও মওলা সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যাঁহার গোলামীর দাবী আমরা করিয়াছি। ইনিই হইলেন চক্ষু উন্মীলনকারী জ্যোতির উৎস। এখন তাঁহার নিকট হইতে সকল জ্যোতি বিকশিত হইবে, যাহা আমাদিগকে খোদার দিকে লইয়া যাইবে।

অতএব হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামই হইলেন আমাদের পথ-প্রদর্শক ও মওলা। তিনিই হইলেন আমাদের নেতা। তিনিই হইলেন আমাদের সৈয়্যদ ও আকা। সদা সর্বদা, তিনিই আমাদের সৈয়্যদ ও আকা থাকিবেন। আমরা তো কোন মুল্যেই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আঁচল ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত নহি। আমাদের হাত কাটা যায়তো যাক্‌। আমাদের শিরোচ্ছেদ করা হয়তো হউক। কিন্তু মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আমাদের নেতা ও প্রভু ছিলেন, আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। এমন কেহ নাই যে, আমাদিগকে তাঁহার (সাঃ) নিকট হইতে পৃথক করিতে পারে।"

"ইহা কিরূপ সম্ভব যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামগণ মৃত্যুকে ভয় করিবে এবং ভীত হইয়া পড়িবে? যখন কি-না মূসা (আঃ) এর গোলামগণ তদ্রূপ করেন নাই !! মূসা (আঃ) এর গোলামদিগকে অর্থাৎ সেই যাদুকরদিগকে যাহারা হযরত মূসা (আঃ) এর মুজেযা দেখিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে ফিরআওন যখন হুমকি দিল যে, "আমি তোমাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলিব এবং তোমাদিগকে

চরম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিব। তোমরা কে? তেমাদের অস্তিত্বইবা কি? তোমাদের এত বড় স্পর্ধা যে আমার অনুমতি ব্যতিরেকে এই ব্যক্তির উপর ঈমান আনিয়াছ, যখন কিনা এই দেশের শাসন দণ্ড আমার হস্তে রহিয়াছে? যখন কি-না আমি বাদশাহ এবং আমি ব্যতীত অন্য কোন বাদশাহ নাই। সকল শক্তি আমার মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। তোমরা কে এবং তোমাদের অস্তিত্বই বা কি যে আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এই মূসার উপর—যাহার উপর খুবই স্বল্প সংখ্যক লোক ঈমান আনিয়াছে——তোমরা ঈমান আনিতে পার?" তাহাদের উত্তর কত আদরনীয়, কত মহান, কি অমর ও কিরূপ অনন্ত জীবন সম্পন্ন উত্তর ছিল!! সে উত্তরটি ছিল এই যে, لا ضير انا الى ربنا منقلبون হাঁ, যাহা ইচ্ছা কর। আমাদের কোন ক্ষতি নাই। আমাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। কেননা আমরা তো আমাদের রব্বের কাছে ফিরিয়া যাইব--নিম্নতম অবস্থা হইতে উর্ধতন অবস্থায় উন্নীত হইব, খারাপ অবস্থা হইতে উত্তম অবস্থার দিকে স্থানান্তরিত হইব। যে রব্বের উদ্দেশ্যে আমরা প্রাণ বিসর্জন করিব, সেই রব্বের হুযুরে আমাদের হাযির হইতে হইবে। সেই জন্য আমাদিগকে তুমি কোন কথার ভয় দেখাও?" যদি মূসার কত্তম সমসাময়িক স্বৈরাচারী বাদশাহকে এই জওয়াব দিতে পারে। তাহা হইলে আজ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামদেরও ইহাই জওয়াব, হাঁ, ইহাই জওয়াব, হাঁ, ইহাই জওয়াব !!!

খোদাতালার কসম! যদি আমাদের দেহকে টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হয়, আর সেগুলিকে কাক ও চিলদের খাওয়াইয়া দেওয়া হয়, আমাদিগকে যদি অগ্নিদগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করা হয় এবং দেহ সমুদ্র এবং জলাশয়ে ভাসাইয়া দেওয়া হয়; তথাপি আমাদের অঙ্গ প্রতঙ্গের অণু পরমাণু ও রন্ধ্র রন্ধ্র হইতে আল্লাহ ও তাঁহার মহব্বতের ধ্বনিই উত্থিত হইবে। ইহা কিরূপে সম্ভব যে, আমরা আমাদের রব্বের দিকে আহ্বান করা ভুলিয়া যাইব? ইহা কিরূপে সম্ভব যে আমাদের রব্বের দিকে ডাকা ছাড়িয়া দিব। ইহা তো আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত ও সাধ্যাতীত ব্যাপার। এই কষ্ট আমাদিগকে দেওয়া যাইতে পারেনা। কেননা এই শিক্ষা আমাদের নাই। ইহা আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ ও প্রকৃতির পরিপন্থী। আল্লাহ্‌র খাতিরে, আল্লাহতা'লার দিকে আহ্বানকারীগণ দুনিয়ার হুমকি হইতে পূর্বেও কখনও ভীত হন নাই, ভবিষ্যতেও কখনও ভীত হইবেন না।

দেখুন, আমাদের আকা ও মাওলা আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চিরকালের জন্য নিজে এই পথ অতিক্রম করিয়া সুনির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। খোদাতা'লার দিকে আহ্বান করিতে তিনি কখনও নিবৃত্ত হন নাই। অতিশয় দুঃখ যাতনা তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে, চরম আঘাত তাঁহার প্রতি হানা হইয়াছে। যিনি ছিলেন সরওয়ারে দু'আলম—দুই জাহানের সর্বাধিরাজ যাঁহার খাতিরেই মহাবিশ্ব ও নিখিল জগতের সবকিছু সৃষ্টি করা হইয়াছে। তিনি এমতাবস্থায় মক্কার গলিগুলির মধ্য দিয়া পথ অতিক্রম করিতেন যে, তাঁহার মাথায় ধুলাবালি ও ছাই ভস্ম নিক্ষেপ করা হইত। কত দুঃখ, কত কষ্ট দেওয়া হইয়াছে আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়া সাল্লামকে! এত কঠিন ও কঠোর যন্ত্রণা ও যাতনা দেওয়া হইয়াছে তাঁহার গোলাম ও অনুবর্তীদিগকে উহা কল্পনা করিলেও আজ শরীর শিহরিয়া উঠে। বিশ্বাস হয় না যে, মানুষের সাহস ও হিম্মত এত উচ্চ ও মহান হইতে পারে!! এ সবকিছু তিনি (এবং তাঁহার গোলামগণ) খোলাতা'লার খাতিরে সহ্য করিয়া যাইতে থাকেন।

কিন্তু এই সবকিছু সত্বেও আমাদের আকা ও মাওলা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' হইতে বিরত হন নাই। সেই ঘটনাটি স্মরণ করুন, যখন আবু তালেব হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে একদিন বলিলেন, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার কওম তো এখন ধৈর্যচ্যুত ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক দুঃখ দিয়াছ তুমি জাতিকে এই দাওয়াতের দ্বারা। তাহাদের ধৈর্যের পেয়ালা উপচাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কওমের লোকেরা চায় তোমাকে বুঝাইয়া-সুজাইয়া যে কোন উপায়ে যাহা পছন্দ হয় তাহা তুমি গ্রহণ কর, কিন্তু তোমাকে যেন বিরত রাখা হয় এই দাওয়াত হইতে। তারপর মক্কার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে কতিপয় প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় যে এই, এই জিনিস তাহারা তোমার সমীপে পেশ করিতেছে, তুমি এইগুলি গ্রহণ করিয়া লও। যদি তুমি বাদশাহাত ও রাজত্ব কামনা কর, তাহা হইলে সারা আরবের রাজদণ্ড তোমার হস্তে অর্পণ করা হইবে। যদি তোমার ধন-দৌলতের অভিলাস থাকে, তাহা হইলে সমগ্র আরবের ধনদৌলত একত্র করিয়া তোমার চরণে আনিয়া রাখিয়া দেওয়া হইবে। যদি সুন্দরী নারীদের আকাঙ্খা রাখ তাহা হইলে সমস্ত আরব ব্যাপী পরমা সুন্দরীদিগকে তোমার হেরেমে আনিয়া দেওয়া হইবে। শুধু একটি-ই শর্ত এই যে, 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' হইতে তুমি নিবৃত্ত হও।" জানেন কি? আমাদের আকা ও মওলা 'সরওয়ারে দু'আলম হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কি উত্তর দিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, "হে চাচা! মনে হইতেছে আপনি ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আমার সঙ্গদানের শক্তি ও ক্ষমতা আপনার আর অধিক নাই। কিন্তু আমি একটি ভুল বুঝা বুঝি দূর করিয়া দিতেছি। যদি আপনার এই ধারণা হইয়া থাকে যে আপনার নিরাপত্তা দানের কারণে আমি 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'র কাজ করিয়া যাইতেছি, আপনার যদি এই ধারণা হইয়া থাকে যে আপনার মুখ দেখিয়া বা মর্যাদার খাতিরে আরবরা আমার উপর হাত দিতে নিবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা হইলে আজই আপনি আপনার হিফাযতনামা প্রত্যাহার করিয়া লউন। লেশমাত্রও এই হিফাযতের আমার প্রয়োজন নাই, আমার দৃষ্টিতে ইহার কানাকড়ির মূল্য নাই। আমি খোদাতা'লার, এবং খোদাতা'লার হিফাযতেই থাকিব।" তারপর তিনি বলিলেন, এই সমস্ত কি প্রলোভন তাহারা দিতে চায়? খোদার কসম যদি সূর্যকে আমার দক্ষিণ হস্তে আনিয়া রাখিয়া দেয় এবং চন্দ্রকে আমার বাম হস্তে আনিয়া রাখে, তথাপি আমি খোদাতা'লার দিকে আহ্বান করিতে বিরত থাকিব না।"

সুতরাং আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে এই আদর্শ ও এই শিক্ষাই বদ্ধমূল রহিয়াছে। ইহারই মৃত্তিকায় গড়া মানুষ আমরা। কিরূপে ইহা সম্ভব যে ঐ যাবতীয় দুঃখ কষ্ট ও নির্যাতনকে ভয় করিয়া আমাদের প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার গোলামগণ পশ্চাদপদ হন নাই এবং অন্তিম মুহূর্ত ও শেষ নিঃশ্বাস অবধি নিজেদের রব্বের দিকে আহ্বান জানাইতে থাকেন, আর আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করিব? বিশ্বাস ভঙ্গ করিব আমাদের সেই মহান প্রভুর প্রতি এবং আমরা এই কার্য হইতে পিছনে হটিয়া যাইব? ইহা কখনও সম্ভব নয়।"

জুমু'আর খুতবা হইতে সংকলণে—নাজির আহমদ ভূঁইয়া

তোহ্‌ফা

কলিজা কপোত হয়
উড়ে ওঠে……
উয়ায়েসের ভাঙ্গা দাঁত ঠোঁটে
ইয়েমেনর আকুল আকাশে;
সিফ্‌ফীনের শহীদি আঘ্রাণ
রক্তের আতরে স্নাত প্রাণ
পূত সমর্পিত। উচ্চকিত এ পৃথিবী
সনাতন সূর্য-প্রতিভাসে।
নবুবী খিলকায় শুভ্র, প্রেম-শুভ্র
উড়ে সে কপোত……
ডানার কম্পনে জাগে অভিভূত প্রাচীন জগৎ।
অব্যক্ত স্বপ্নের বাণী ফোটে
পাখি উড়ে ওঠে,
কণ্ঠে রূহে-আমীনের নাম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
জ্ঞানের তোরণ চুমে
হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ চুমে
উড়ে সে কপোত……
আদিম অরণ্য শীর্ষে উড়ে
মেঘমালা ভিন্ন করে
উড়ে দূর নীল আসমান
পিছে ফেলে বয়সিনী পৃথিবীর পরকীয়া টান,
আজাজিলী মৃত্তিকার উদ্ধত ফসল,
এবং সকল
অবাধ্য সমুদ্র অহংকারের জন্মান্ধ সৈকৎ।
সমগ্র সৃজন-পুঞ্জ তার চোখে হেয়
সুপ্ত সত্তা প্রকাশের সে আনন্দ-রাহী
প্রেমের প্রতীক আজ সেও,
কেননা, সে আজ
উয়ায়েসের অদেখা প্রেমের পরিবাহী।

কিনানের নির্বাসিত মাতৃপ্রাণ ডাকিছে তাহারে
ডাকে স্নিগ্ধ জমজমের অশ্রুধৌত অতলান্ত স্রোতে,
প্রতিবারে,
সাড়া দিয়ে তারে,
উড়ে উঠে আরাফাত
উড়ে সাফা মারওয়ার মরু বিয়াবান
কপোতের তীর্থের সে পথে···
কা'বার প্রাচীন স্বপ্ন ঝরে
ঝরে বুং-শিকনের প্রাণ
ঝরে আদি পুরুষের প্রার্থনার অমৃত-আহ্বান।
সেই অমৃতের ডাক
শুনেছিল একবার, তাই
এ প্রকৃতি পেয়েছে প্রমাই
এ নিয়তি নিয়ম পেয়েছে
মহাকাল স্বীকৃতি পেয়েছে
অর্থবহ হয়েছে সৃজন;
এই গ্রহ, ওই সূর্য তারা ছায়াপথ
ছুটে শূন্যে। কেননা, কপোত
ঝরায়ে গিয়েছে অবিরাম
অমৃতের মধু গুঞ্জরণ
সেই প্রিয় নাম
আলোকিত আলোকের নাম—
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
উড়িছে কপোত নভে, উড়ে পত্ পত্·····
·····নক্ষত্রে·· নক্ষত্রে···
তারি ত্রস্ত কানাকানি
নম্র হাতছানি;
চকিতে আড়াল করে শায়াতীন পেতে রয় ওৎ
বাধ সাধিবার, ব্যর্থতার, যত্রে, তত্রে।
তবু সে কপোত
স্থানের, কালের সীমা প্রাগৈতিহাসিক
প্রজ্ঞার পার্থিব সব বক্র ঐকান্তিক
বিভ্রান্তি লংঘিয়া উড়ে
উড়ে সব চৈতন্যের অনন্য অপার
আকাশে, আকাশে···
এবং আত্মার, প্রার্থনার,

তৃতীয়……
চতুর্থ…সব,…সবশেষে
সীমাহীন অসীমের সপ্তম আকাশে
পাখি বসে
আলোর আরেশে
বায়তুল মা'মুরের মিনারার পাশে।
শুধায় ফিরিশ্‌তা তারে প্রিয় জিব্রাঈল—
'কে তুমি কপোত
এত দীর্ঘ পথ
কী করে দিয়েছ পাড়ি, কোথায় মঞ্জিল?'
'আমি পাখি
মসীহি প্রেমের পরিবাহী।
আত্মলীন অতল অপার
প্রেমের সে তোহ্‌ফা তাঁরই সমর্পিব প্রিয়েরে তাঁহার:
যে প্রিয় খোদার রূপে ইলাহী-অনল
যে প্রিয় প্রিয়ের তাঁর
সব মহিমার, গৌরবের,
ঊর্ধতম আরশে আসীন।
যে প্রিয় সে প্রী'তমের মিলনের অহমে নিঃসীম
রূপ যার রউফ ও রহীম
রূপে যার নিরন্তর মণি ও হীরার বৃষ্টি ঝলমল
ঝরে অবিরল
'যে রূপের সঞ্চরণে উত্তরণ এ পথে আমার
আমি তাঁর
কল্পনার, চেতনার, অন্যপারে দূর·· অতি দূর…
সিদরাতুল মুন্তাহার রাহী।'
'কার সাধ্য পৌঁছে সেই
আহাদের
অদ্বিতীয়ত্বের অতি তীব্র আলোকের লোকে,
ফিরিশ্‌তা? অথবা ইনসান?
অথচ এ ক্ষুদ্র পাখি,
পৃথিবীর নীড় ছেড়ে উড়ায় একাকী
বস্তুর সীমানা ছেড়ে
উড়ায় সে অজানার সেই লোকে লোকে
কী আশ্চর্য।'

মুগ্ধ রূহে কুদ্দুসের আঁখি
চেয়ে থাকে অনিমেখ ঐকল্যের দূর ঊর্ধলোকে
অন্তহারা অনন্তের ঐশী আসমানে
উড়ন্ত সে কপোতের পানে……
উড়ায় সে পাখি একা
উড়ায় আত্মার তীর্থে
নাই তার বিরতি বিরাম,
কণ্ঠে রূহে-আমীনের নাম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
রূপের অরূপ সেই অনুপম অপরূপ আলোকের দেশে
অবশেষে
পাখি নামে
চিরন্তন জান্নাতের মহীরূহে আলো ঝরা পল্লবিত শাখে,
প্রেমের তোহ্‌ফা সে রাখে
ধীরে অতি ধীরে
খোদায়ীর দরিয়ার তীরে;
উত্তাল তরঙ্গে তার ওঠে উচ্চ নাম—
'প্রশংসিত' প্রথম কালাম :
'খোদায়ীর বিকশিত নাম
আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম॥
আলোকের অতি শুভ্রতায়
পাখি তার নিজেকে হারায়
সহসা নতুন এক প্রাণ জাগে
জাগে নব অস্তির আঘ্রাণ
পরিপূর্ণ বিকাশের বিদগ্ধ সন্ধান।
অযুত জীমূত-মন্দ্রে জাগে স্বর
অনন্ত অবিনশ্বর
সে নতুন আলোকের উচ্চতম দিগন্তের অন্যপার হ'তে
কহে সে কপোতে—
'তোহ্‌ফা গৃহীত তব,
ওহে পাখি,
এবার বিদায়…
শুভাশীষ ও সালাম তোমায়।'
কহে পাখি
তুলে নব অস্তিত্বের সকৃতজ্ঞ আঁখি।

'আপনার
প্রেমের এ অমৃতের এ তোহ্‌ফা তুমি
করেছ কবুল।
তাই,
ধন্য আমি। আর
ধন্য এ অনন্ত লোকে সফর আমার,
আমি আজ
অভ্রান্ত দৃষ্টির এই ইন্তেহায়ী সিদ্‌রার আলোর প্রবাহী।
কিন্তু,
যে প্রেম অতুল
সর্ব ব্যাপী। সে তো মসীহার,
সে নহে আমার।

আমি শুধু সেই
সৃজনের মননের রূপে ঋদ্ধ
নবীদের নন্দিত সাধনা-সিদ্ধ
মসীহি প্রেমের এক
অতি-পরিবাহী।
তোমার সে মসীহার মুহাম্মাদী প্রেম
বুকে রাখি,

আবার আসিব আমি ফিরে
আলোর এ সমুদ্র-তীরে
আমি তব সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার পাখি।
সেই প্রিয় প্রেম,
আর
এই ক্ষুদ্র পরিবাহী তাঁর
তোমারই তো একান্ত সম্পৎ।
আমার চাওয়ার কিছু নেই,
আমি তব দীদারের তৃষিত কপোত।'

—শাহ্‌ মুস্তাফিযুর রহমান

"মুহাম্মাদ সাঃ দুই জাহানের ইমাম এবং প্রদীপ।
মুহাম্মাদ সাঃ যমীন ও আসমানের দীপ্তি॥
খোদার ভয়ে তাঁহাকে খোদা বলি না।
কিন্তু খোদার কসম তাঁহার সত্বা জগদ্বাসীর জন্য খোদা
দর্শনের দর্পণ স্বরূপ।"

(ফারসী দুররে সামীন)

বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় ও প্রতিকার

খাতামান্নাবীঈন ঃ বাস্তবতার নিরিখে

নিম্নে আমরা ক্বুরআন পাকের কিছু আয়াত ও আয়াতাংশের বাংলা তর্জমার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এ সবের মাঝে আল্লাহ্ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা নিয়ে ক্বুরআন পাকের প্রকৃত অনুসারীগণ সংগত কারণেই বিশেষ গর্ববোধ করতে পারে এবং তা আমরা করেও থাকি। ও সব আয়াত ও আয়াতাংশ হলো ঃ

আমরা ক্বুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং আমরাই উহার হিফাযতকারী।

[সূরা আল্ হিজর ঃ ১০ আয়াত]

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাংগ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম।

[সূরা মাইদাহ্ ৪ ঃ আয়াত]

মুহাম্মাদ তোমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নহে, বরং সে আল্লাহ্র রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। [সূরা আহ্যাব ঃ ৪১ আয়াত]

আমরা তো তোমাকে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করিয়াছি।

[সূরা আম্বিয়া ঃ১০৮ আয়াত]

আমরা তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। [সূরা সাবা ঃ ২৯ আয়াত]

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির (মঙ্গলের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে ঃ তোমরা সৎকর্মের নির্দেশ দান কর, অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং আল্লাহ্কে বিশ্বাস কর।

[সূরা আলে ইমরান ঃ ১১১ আয়াতাংশ]

এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করিবে, ফলে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন—নবী, সিদ্দীক শহীদ এবং সালেহীনের মধ্য হইতে এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে সর্বোত্তম।

[সূরা নিসা ঃ ৭০ আয়াত]

এবং যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলগণের প্রতি ঈমান আনিয়াছে, তাহারাই তাহাদের খোদার নিকট সিদ্দীক ও শহীদ। [সূরা হাদীদ ঃ ২০ আয়াতাংশ]

আমরা অবশ্যই তোমাকে কাওসার (কল্যাণের প্রাচুর্য) দান করিয়াছি।

[সূরা কাওসার ঃ ২ আয়াত]

তুমি বল হে নবী ! নিশ্চয় আমরা তোমাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষী ও সুসংবাদদাতা এবং সতর্ক কারী রূপে এবং আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁহার দিকে আহ্বানকারী দীপ্তিমান প্রদীপ স্বরূপ। সুতরাং তুমি মু'মিনদিগকে সুসংবাদ দাও যে, তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ হইতে অবধারিত আছে মহা কল্যাণ। (সূরা আহ্‌যাব : ৪৬-৪৮ আয়াত)

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান রাখে এবং পূণ্য কাজ করে তাহাদের সংগে আল্লাহতা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের মধ্যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করিবেন যে ভাবে তিনি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহাদের পূর্ববর্তীদের [অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের] মধ্যে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাহাদের জন্য সুদৃঢ় করিয়া দিবেন তাহাদের দীনকে যাহা তিনি তাহাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং ভীত হইবার পর তাহাদিগকে তৎপরিবর্তে নিরাপত্তা দান করিবেন। তাহারা আমার ইবাদত করিবে, আমার সহিত তাহারা কাহাকেও শরীক করিবে না এবং তৎপর যাহারা কুফর করিবে, তাহারা দুস্কৃতিপরায়ণ হইবে।" [সূরা নূর : ৫৬ আয়াত]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ হতে দেখা যায় আল্লাহ্‌ স্বয়ং কুরআন পাকের হিফাযতের ভার নিয়েছেন। এই ঐশী কিতাবের মারফত দীনকে পূর্ণাংগ, তাঁর অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ ও দীন হিসেবে ইসলামকে মনোনীত করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বিশ্ব জগতের প্রতি রহমতরূপে এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বোপরি তাঁহাকে 'খাতামান্নাবীঈনের' মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। তাঁর উম্মতকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেয়া হয়েছে যারা আধ্যাত্মিকতায় সালেহীন হতে নবী মর্যাদায় পৌঁছুতে পারে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পূর্ববর্তী নবীগণের অনুসরণে তাঁদের অনুগামীগণ সিদ্দীক হওয়ার মর্যাদা পর্যন্ত লাভ করতে পারতেন। মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কিছু হাদীসের উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে যাতে উম্মাহ্‌র জন্য ভয়াবহ আশংকা প্রকাশ পেয়েছে, এমন কি চরম অধঃপতনের ভবিষ্যদ্বানীও রয়েছে। আবার কতকগুলো হাদীসে এ অধঃপতন কাটিয়ে ওঠার এবং ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উজ্জল ভবিষ্যতের কথাও রয়েছে।

হাদীসগুলোর বাংলা তর্জমা :

"দীনের এলেম উঠিয়া যাইবে, জাহেলিয়াত প্রসার লাভ করিবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাইবে এবং নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, নেক কাজ কমিয়া যাইবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরিয়া যাইবে, ঝগড়া বিবাদ বৃদ্ধি পাইবে, মারামারি কাটাকাটি বেশী হইবে, ব্যবসায়ীদের মাঝে ঈমানদারের অভাব হইবে, ভূমিকম্প বেশী হইবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাইবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া মানুষ গৌরব অনুভব করিবে, দলের সর্দার ফাসিক [দুর্নীতি পরায়ণ] হইবে। উটনী বেকার হইবে, উহাতে চড়িয়া মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করিবে না।" [বুখারী, মুসলিম]

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের অক্ষর গুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু হেদায়াত-শূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাহাদের মধ্যে হইতে ফেৎনা ফাসাদ উঠিবে, এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে। [বায়হাকী ফি শেয়াবিল ঈমান, মিশকাত]

ইসলামের পুনর্জাগরণ ও বিশ্বময় এর পুনঃপ্রতিষ্ঠার উজ্জল ভবিষ্যদ্বানী :

"তাহাদিগের অন্যান্যের জন্যও যাহারা এখনও তাহাদিগের সহিত মিলিত হয় নাই। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" [সূরা জুমু'আর ৪ : আয়াত]

এ আয়াতের নযুল সম্বন্ধে হযরত আবু হুরায়রা রাঃ বলেন: আমরা রসূল করীম (সাঃ) এর নিকট বসিয়াছিলাম। সূরা জুমু'আ, যার মাঝে 'ওয়া আখারিনা মিনহুম' আয়াত আছে, নাযিল হইল। রসূল করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হইল 'হে আল্লাহর রসূল! তাঁহারা কে (যাহারা এখনও আমাদের সহিত মিলিত হন নাই)? রসূল করীম (সাঃ) নীরব রহিলেন, এমন কি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন সালমান ফারসীও আমাদের মধ্যে ছিলেন। হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁহার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলিয়া গেলেও তাঁহাদের [পারশ্য বংশোদ্ভূত] এক বা একাধিক ব্যক্তি তথা হইতে উহাকে নামাইয়া আনিবে।"

(বুখারী : কিতাবুত্ তফসীর)

"নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন মহাপুরুষকে আবির্ভূত করিবেন, যিনি তাহাদের জন্য ধর্মকে সঞ্জীবিত করিবেন।"

(আবু দাউদ ২য় খণ্ড)

হযরত জাফর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আনন্দিত হও, আনন্দিত হও, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের দৃষ্টান্ত সেই মেঘের মত যাহার প্রথম দিকটা ভাল, কি শেষের দিকটা ভাল, তাহা বলা যায় না; কিংবা সেই বাগানের মত যে বাগান হইতে একদল লোককে এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং আর এক দলকে আর এক বৎসর খাইতে দেওয়া হইয়াছে। হইতে পারে, এই উম্মতের শেষের দিকটা অধিকতর বিস্তৃত, অধিকতর গভীর এবং অধিকতর উৎকৃষ্ট হইবে। কেমন করিয়া সেই উম্মত ধ্বংস হইতে পারে, যাহার প্রথম দিক দিয়া আমি এবং মধ্যভাগে মাহ্‌দী, আর শেষের দিক দিয়া মসীহ্ হইবেন। কিন্তু ইহার মধ্যবর্তী সময়ে বক্রগামী দল হইবে; তাহারা আমার হইতে নয় এবং আমি তাহাদের হইতে নহি; অর্থাৎ তাহাদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই।" (মিশ্‌কাত)

"প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হইবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহ্‌দীর সহায়তা করা।"

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, কিতাবুল মাহ্‌দী)

কুরআন পাককে হিফাযত বা সংরক্ষণের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে বিষয়টিকে গভীর ভাবে তলিয়ে দেখতে হবে। আল্লাহ্‌ ইচ্ছা করলে পূর্ববর্তী সব কিতাবও সংরক্ষণ করতে পারতেন। কথা না বাড়ায়ে বলা যায় ওসব কিতাবের কোনটার সময়েই দীন তথা ইসলামের পূর্ণতা দানের সময় আসেনি, পরিবেশও সৃষ্টি হয়নি। তাই ওসব কিতাব আল্লাহ্‌র খাস হিফাযত হতে বঞ্চিত হয়েছে। কেননা পরবর্তীদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য ওসব যথেষ্ট ছিল না।

এখানে ঐশী কিতাবাদির কিভাবে বিকৃতি ঘটেছে তা নিয়েও কিছু আলোচনার প্রয়োজন। প্রধানতঃ নবীর তিরোধানের পর তাঁর অনুগামীরাই তাদের কিতাবের বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং এখনও ঘটাচ্ছে।

বিকৃতির তিনটি বড় দিক হলো : ১) শব্দ বা বাক্যের পরিবর্তন অর্থাৎ কিতাবের কোন কোন মূল শব্দ বা বাক্যকে বাদ দিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নতুন শব্দ বা বাক্যের সংযোজন ঘটিয়েছে। ২) মূল ভাষা হতে ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত করে ঐ ভাষাকে (যে ভাষাতে রূপান্তরিত করা হয়েছে) মূল ভাষার মত মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া অথচ অনুবাদ সর্বক্ষেত্রে মূল ভাষার তাৎপর্য বহন করতে পারেনা। এতে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে মূল ভাষার কিতাব পাওয়া না গেলে অনুবাদই মূলের স্থান দখল করে বসে। ৩) ব্যাখ্যার বিকৃতি : আল্লাহ্‌র কথা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু অনেক তাৎপর্যবহ হয়। আল্লাহ্‌র সাথে যাদের সংযোগ যত নিবিড় হয় তারাই ঐশী কথার প্রকৃত তাৎপর্য তত বেশী গভীর ও ব্যাপকভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারেন। এ কারণে নবীগণ ঐশী বাক্যের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা দাতা হয়ে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সরাসরি অনেক ব্যাখ্যাও পেয়ে থাকেন।

ব্যাখ্যা জনিত বিকৃতির অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এ বিকৃতির পেছনে যেসব কারণ কাজ করে ওসবকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়।

ক) সময়ের দূরত্ব, নবী জীবনে মহতি সাহচর্য তাঁর অনুসারীদের জীবনকেও বিশ্বাস ও নিষ্ঠার অনুপাতে মহৎ করে তোলে। নবীর তিরোধানের পর সময়ের দূরত্ব যতই বাড়তে থাকে, নবী জীবনের 'সংস্পর্শ' বা সাহচর্য জনিত পবিত্রকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব ক্ষীণতর হতে থাকে। অথচ ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে এ প্রভাবই হলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কার্যকর উপাদান। সকল নবীর উম্মতের ইতিহাসই এ সাক্ষ্য বহণ করে।

(খ) নবীর জামা'ত যতই বাড়তে থাকে ততই বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার সংস্পর্শে আসে। যারা পূর্বেকার ধর্ম ছেড়ে নতুন ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের মাঝে পূর্বেকার অনেক সংস্কার কুসংস্কার থেকে যায় বিশেষ করে যখন দলে দলে ধর্মান্তরিত হয়। তখন যদি প্রয়োজনীয় তা'লীম তরবীয়তের ব্যবস্থা না করা যায় এবং প্রায়ই তা হয়ে ওঠে না, নব দীক্ষিতদের অনেক ধ্যান-ধারণা সংস্কার-কুসংস্কার নব ধর্মের বিকৃতির বড় কারণ হয়ে পড়ে।

(গ) স্বার্থান্বেষীরা মনগড়া ব্যাখ্যা দ্বারা ধর্মের ভয়াবহ বিকৃতি ঘটায়। সমাজ জীবনে তা চালু করার জন্য তারা হীনতম ষড়যন্ত্রের নানা জাল বিস্তার করে থাকে

বিশেষ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের বেলায় তা হয়ে থাকে বেশী। ইতিহাসে এর অনেক উদাহরণ মিলে। ক্ষমতাসীনদের অবৈধ কাজের শাস্ত্রীয় সমর্থন যোগাতে সমকালীন ওলামাদের অনেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের চেয়ে দুনিয়া অর্জন যাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দেয়। তারা এরূপ সুযোগ-সন্ধানী হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

(ঘ) এসব ছাড়া বিধর্মীদের মিথ্যা প্রচারের ফলেও নিজ ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদের মনে নানা ভ্রান্ত ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ওসবকে তারা নিজ ধর্মের শিক্ষা বলে মনে করে ও বিভ্রান্ত হয় এবং নিজ ধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে পড়ে।

(ঙ) ধর্মে অন্ধ-গোঁড়ার দল সৃষ্টি হয়। যারা অন্ধভাবে নিজেদের বা পূর্ব পুরুষদের ধ্যান ধারণা অনুসরণ করাকেই চরম বলে বিবেচনা করে। তারা উদারতা, যুক্তি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। তারা মূল কিতাবাদির সাথে তেমন সম্পর্ক রাখে না। তাদের চিন্তা ভাবনা ও জানার বাইরে যে কিছু থাকতে পারে তাও মানে না। অজ্ঞতা, অশিক্ষা কুশিক্ষা প্রধানতঃ দায়ী। তারা বিকৃত ধর্মের প্রধান বাহক। বস্তুতঃ পাক কুরানের ভাষায় ওরাই কিতাব বহনকারী গাধা। এসব কারণে ধর্মজগতে নানা বিকৃতি সৃষ্টি হয় এবং সমাজ জীবনে বিভিন্ন স্তরে ওসব শিকড় গেড়ে বসে ও ধর্মের নামে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের দ্বারকে প্রশস্ত করে চলে। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে নেই। এর তেমন প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। কেননা ধর্মের নামে বর্তমানে চতুর্দিকে যে অধর্মীয় কাজ ও ব্যবসা চলছে এর সাথে কমবেশী সবারই পরিচয় আছে। এ নিয়ে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিস্তারিত সচিত্র আলোচনা হচ্ছে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কুরআন পাকের সংরক্ষণ ও মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

কুরআন পাকের সংরক্ষণের ভার আল্লাহ্‌ নিয়েছেন এবং তা করেছেনও। শুধু তাই নয়, এমন ব্যবস্থাদিও নিয়েছেন যার ফলে কুরআন পাকের বাক্য, শব্দ এমন কি কোন যের যবরে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাই ইসলামের চরম শত্রুও সংরক্ষণ সম্বন্ধে দ্বিমত পোষণের সুযোগ পায় না। এ নিয়ে কুরআন পাকের অনুসারীদের ভাবনার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। যে কথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না তাহলো অবিকৃত কুরআন পাক ঘরে ঘরে পৌঁছে দিলেই মানুষের বিকৃতি রুদ্ধ হবে না। তাছাড়া আরো যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব সহ বিবেচ্য তা হলো কুরআন পাকের ব্যাখ্যায় বিকৃতি আসবে না বা আসতে পারে না এমন কোন নিশ্চয়তা আল্লাহ্‌ দিয়েছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য অপব্যাখ্যার আপদ হতে বাঁচার বা সঞ্চিত অপব্যাখ্যা দূর করার উপায় উপকরণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ ও রসূল করীম (সাঃ) পথের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন।

ওসবের আলোচনায় যাওয়ার আগে যে বিষয়ের উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক তা হলো যে সব কারণে আসমানী কিতাবাদীর ব্যাখ্যায় বিকৃতি ঘটে সেগুলো কুরআন পাকের বেলাতেও

পূর্ণমাত্রায় কাজ করে চলেছে। এমন কি হাজার হাজার জাল হাদীস আমদানী করে কুরআন পাকের সঠিক ব্যাখ্যার পথে শত শত বেড়াজালে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সবের ফলশ্রুতিতে মুসলিম জাহান শতধা বিচ্ছন্ন ও দলে উপদলে বিভক্ত। নিজেদের মাঝে তারা রক্তের হোলি খেলায় মত্ত। নৈতিক ও অধ্যাত্মিক অবক্ষয়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পরম শক্তির আশ্রয় হতে বঞ্চিত হয়ে তারা পরাশক্তির লেজুড়গিরীতে গর্বিত। এ বাস্তবতা বড় করুণ, বড়ই হৃদয় বিদারক। যে উম্মতের উপর আল্লাহ্ দুনিয়াকে কলুষমুক্ত করার পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তারাই কলুষতায় পরিপূর্ণ, জরাজীর্ণ। প্রকৃতিতে দেখা যায় যে জিনিষ যত ভাল, পচলে তত বেশী দুর্গন্ধ হয়। উম্মাহ্‌র আজ তাই হয়েছে। সর্বোৎকৃষ্ট সর্ব নিকৃষ্টের রূপ নিয়েছে। এতেও চৈতন্য হচ্ছে না। আরো তলিয়ে যাওয়ার জন্য যেন তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এসব বেদনাদায়ক কথা রেখে মুক্তির সন্ধান খুঁজলে দেখা যাবে মুতাশাবিহাত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় সর্তক থাকা মোজাদ্দিগণের ও প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন ও নবুওয়াতের মাধ্যমে খিলাফতের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হলো কুরআন পাকের অপব্যাখ্যা নিরসন এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পতন রোধের খোদা-নির্দ্দিষ্ট পথ।

(১) কুরআন পাকের আয়াত সমূহকে তাৎপর্যের দিক থেকে মুহ্‌কামাত ও মুতাশাবিহাত এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। আমাদের সদা সচেতন থাকতে হবে যাতে মুতাশাবিহাতুন আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মুহ্‌কামাতুন আয়াতের বিরুদ্ধে না যাই। এতে ব্যাখ্যা বিকৃতির একটা বড় দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে। 'রূপকের অপরূপ' [ইতিপূর্বে পাক্ষিক আহ্‌মদীতে] এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে আর কথা বাড়াচ্ছি না।

(২) আল্লাহ্‌র রসূল যে মোজাদ্দিদের আগমনের শুভ সংবাদ দিয়েছেন, কোন শতাব্দীতো এ হতে বঞ্চিত হতে পারে না। অবজ্ঞা অবহেলার দরুন উম্মাহ্ তা হতে দূরে সরে আছে কিনা সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া।

(৩) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী আঃ এর আগমনের লক্ষণ সমূহ পূর্ণ হয়ে থাকলে এসবের পূর্ণতার ব্যাখ্যা দিয়ে কেহ আল্লাহ্‌র হয়ে দাবী করেছেন কিনা ও করে থাকলে তিনিও তাঁর জামা'ত বিশ্বময় ইমলামের প্রতিষ্ঠায় কি ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছেন এসব বিষয় মুক্ত বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা?

(৪) খিলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলিম উম্মাহ্ বার বার আন্দোলন করে ব্যর্থতার গ্লানি বহন করছে কেন? মানবীয় চেষ্টায় খিলাফত যে প্রতিষ্ঠা করা যায় না তা উপলব্ধি করার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে নবুওয়াতের মাধ্যমে কোন খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না।

(৫) যে নবুওয়াতের মাধ্যমে এ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা খাতামান্নাবীঈনকে ব্যর্থ বা খর্ব করে, না সার্থক ও গৌরবান্বিত করে।

এসব প্রশ্নের ঐশী সমাধান শুধু মাত্র আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ আঃ এর দাবী মেনে নেয়ার মাঝেই নিহীত রয়েছে। এর মাঝেই রয়েছে মুসলিম উম্মাহ্‌ ও বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় দূরীকরণের স্রষ্টা-নির্দিষ্ট সঠিক পথ ও পদ্ধতি! তাই জগদ্বাসীর কাছে বিনীত আরয, তারা যেন হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ আঃ এর দাবীকে নিজেদের সামগ্রিক কল্যাণের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে খোলা দিলে বিচার করে দেখেন এবং সর্বোপরি সর্বজ্ঞানী ও সর্ব কল্যাণময় আল্লাহ্‌র দরগাহে দরদে দিলে দো'আর দ্বারা মীমাংসায় পেঁৗছান। এখানেই আমাদের আলোচনার ইতি টানা যায়। তা সত্বেও এখানে আরো কিছু বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। তা না হলে যে নাম দিয়ে 'খাতামান্নাবীঈন বাস্তবতার নিরীখে' এর প্রতি অবিচার করা হবে।

দুনিয়াতে এক বা দুই লক্ষ ২৪ হাজার নবী প্রেরিত হয়েছেন। প্রত্যেককেই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী আঃ এর বেলায়ও কোনই ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাঁর বিরোধিতায় সার্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে যে বিষয়টি তা হলো হযরত মুহাম্মাদ সাঃ কে আল্লাহ্‌ ''খাতামান্নাবীঈন' বলেছেন। সুতরাং তাঁর পরে আর কোন নবীরই আগমন হতে পারে না—এটা ভ্রান্ত ধারণা। তাই বাস্তবতার নিরিখে এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যে এবং সে বক্তব্য বুঝতে ও উপলব্ধি করতে যাতে সহায়ক হয় সে জন্যই পটভূমির রূপে এত কথা বলতে হয়েছে।

রসূল করীম সাঃ এর মারফত দীনকে পূর্ণাংগ করা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করা, পূর্ণাংগ ইসলামকে মানবজাতির জন্য মনোনীত করা, রসূলুল্লাহ সাঃ কে বিশ্ব জগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করা—বর্তমান যমানাতে বিশ্বগ্রাসী বিশেষ করে মুসলিম জাহানের চরম নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে এ সবের কোন বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় কি? অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের ন্যায় মুসলমানেরাও একই গ্লানি বহন করছে। শ্রেষ্ঠ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব সমাজ জীবনে তো মিলেই না, অনুবীক্ষণ দূরবীক্ষণ দ্বারা পাওয়াও দুরূহ। এজন্যই হযরত রসূস মকবুল সাঃ এর কণ্ঠে ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলে উঠে যাওয়ার কথা ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু সে ধ্বনি তাঁর উম্মতের কয়জনের কর্ণে প্রবেশ ও হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে?

নবুওয়াত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠতম রহমত বা নেয়ামত। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর আগমনে যদি এর দ্বার রুদ্ধ হয়ে থাকে তাতে দুনিয়া স্রষ্টার শ্রেষ্ঠতম নেয়ামত হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁর আগমনে যদি মানুষের জন্য [অন্ততঃ তাঁর উম্মতের জন্য] নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের দ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যেতো তবে আর নবী আসার প্রয়োজন হয়তো ফুরিয়ে যেতো। তাতো মোটেও হয়নি, হওয়ার কোন ক্ষীণ আভাস কোথাও দৃষ্টি গোচর হচ্ছেনা। বরং সর্বত্র নিরাশার ঘন কুয়াশা বিস্তার লাভ করছে।

বাইবেলে একটি সুন্দর কথা আছে—ফলে গাছের পরিচয়। মানুষের জীবনে এর প্রয়োগ করতে গেলে আদর্শের কথা উঠে। কোন আদর্শ বিচারের বাস্তব ও প্রামাণ্য মাপকাঠি হলো ঐ

আদর্শের অনুগামীদের জীবন। অর্থাৎ তারা ভাল না হলে তাদের আদর্শকে ভাল বা নিখুঁত বলার গুরুত্ব থাকে না। এখানে আরো যে প্রশ্নটি ওঠতে পারে তা হলো কোন গাছ তথা আদর্শ শুরুতে ভাল ফল দিয়েছিল কিন্তু পরে যদি পচাফল দিতে থাকে তবে কতটুকু ভাল বলা যাবে ?

বর্তমান যমানায় ধর্ম জগতের অবস্থা নিয়ে বিচার বিবেচনা করলে যে কোন ধর্মের অনুগামী-দের তাদের ধর্মের অনুগামীদের সাথে তুলনা করলে তাদেরকে পচা ফল বলাই যথেষ্ট হবে না, 'ভীষণভাবে পচা বলাই' সঠিক হবে। এ নিয়ে কথা বাড়ানোর তেমন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

তবে পচা ফলের অজুহাতে ধর্মরূপ সব বৃক্ষ হতে দূরে থাকাই সমীচীন বলে বুদ্ধিমানের কাজ হবেনা। এখানেই ইসলামের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এবং তা রসূল করীম (সঃ)-এর খাতামান্নাবীঈন হওয়ার মাধ্যমে ফুটে ওঠেছে। তা হলো তাঁর উম্মতের জন্য 'উম্মতি নবী' হওয়ার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। অনুরূপ নবীর আগমনে এই বৃক্ষে আবার সুফল ফলতে থাকবে।

বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিভংগীতেও গভীরভাবে তলিয়ে দেখা ও উপলব্ধি করা যায়। আলেম ও ওলামাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাক। তাদেরকে বনী ইসরাইল নবী-সদৃশ বলা হয়েছে। তারা যদি আধ্যাত্মিক জগতের ঐ স্তরে থেকে থাকেন তবে তারা এ অবক্ষয় রোধে ব্যর্থ হচ্ছেন কেন ? কেন খিলাফত প্রতিষ্ঠায় তাদের সব প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে না ? সব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজতে হবে। তাতেই মিস্‌লিঙ্ক বা হারানো সূত্র পাওয়া যাবে। সে সূত্র পেলেই আমরা বলতে পারবো রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীনের আগমনে অবক্ষয়ের দ্বার প্রশস্ত হয়নি। হতে পারে না। বরং তাঁর আগমনে সর্ব জাতির জন্যই এই রহমতের দ্বার খুলে ধরা হয়েছে। বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-কে খাতামান্নাবীঈন উপাধিতে ভূষিত করার মাঝেই, সে সত্য নিহিত আছে।

রসূল করীম (সাঃ) নবীগণের মোহর। মোহরের তাৎপর্য শেষ অর্থাৎ তাঁর পরে নবীই আগমন হবে না ধরলে অবক্ষয় রোধের কোন পথই যে বাকী থাকে না এবং এর পরিনতি কি দাঁড়ায় বর্তমান যমানার বাস্তব অবস্থাই এর অকাট্য প্রমাণ। অপর দিকে মোহরের কার্যকর দিকের কথা বিবেচনা করলে সব প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যাবে। মোহরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—বিধি সংগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত (অথারিটি) ও সনাক্তকরণ (আইডেন্টিফিকেশন)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খাতামান্নাবীঈন হওয়ার তাৎপর্য হলো, তিনি সব নবীর নবুওয়াতের সনাক্তকরণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সে নবী পূর্ববর্তী বা পরবর্তী হউক। এভাবেই তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষের জন্যই রহমত বহণ করে এনেছেন ও'রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন' হয়েছেন। এখন এর বাস্তবতা নিরীক্ষণ করা যাক। দুনিয়াতে যত নবীর আগমন হয়েছে সবার উপর ঈমান আনা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রকৃত অনুসারীর জন্য অত্যাবশ্যক। রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর মাধ্যমে সকল নবীর স্বীকৃতি দেশ কাল জাতি বর্ণের উর্দ্ধে ওঠে শুধু নবীগণকে নয়

তাঁদের উম্মতদেরকেও আমাদের কাছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও আমাদেরকে তাদের কাছে যাওয়ার পথকে সুশপ্রস্ত করেছে। প্রসংগত বলা যায় এ উপলব্ধিকে প্রেম প্রীতির মাধ্যমে কাজে লাগালে ধর্মীয় দুশমনি অনেকখানি হ্রাস পাবে, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পথও সুগম হবে, অবক্ষয় রোধ ও অশান্ত পৃথিবী শান্তির সন্ধান পাবে। সমগ্র পরিবেশ দোষণমুক্ত হবে।

এখন রসূল (সাঃ)-এর পরবর্তীতে নবীর আগমনে আসা যাক। অতীতে দেশ বা জাতির ভিত্তিতে নবীগণ প্রেরিত হতেন। কিন্তু হযরত নবী করীম (সঃা)-এর আগমনের পর হতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মুহাম্মাদী শরী'আতকে ভিত্তি করে নবীর আবির্ভাব হবে। এ শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দিতেই যে কোন দেশ বা জাতিতে নবীর আবির্ভাব হতে পারে। ইহা মুহাম্মাদী শরীয়তের বিশ্ব জনীনতারও শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। এখানেই রসূল করীম (সাঃ)-এর রাহ্‌মাতুল্লীল আলামীন আখ্যায় ভূষিত হওয়ার আধ্যাত্মিক সার্থকতা নিহিত রয়েছে। অন্য কোন শরী'আতের অনুসরণে এই স্তরে পৌঁছার দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। বস্তুতঃ এখানেই রসূল করীম (সাঃ) কে কাওসার দানের পরম বিকাশ। এতে আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর আনুগত্যে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সব কয়টি স্তরই পূর্ণ হয়। অপরদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না হয়ে বৃদ্ধি পায়।

রসূল করীম সাঃ কে নবীদের শেষ তো বলা যায় না। তবে একমাত্র তিনিই যে নবুওয়াতের পরিধির শেষ সীমায় পৌঁছেছেন এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই। কোন নবী রসূলই ঐ সীমায় পৌঁছেননি, পৌঁছুতে পারেনও না—তাঁর আগমন হুযুর সাঃ এর আগে বা পরে যখনই হয়ে থাকুক না কেন। এখানে হুযুর সাঃ অনন্য।

কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। কিন্তু নিজে কথা বলে না। আদম সন্তানদের অবক্ষয় বা নিজের বিকৃতি বা অপব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন মানুষের উচ্চারণে কথা হয়। তার আমলের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন বাস্তব রূপ পায় এবং আদর্শের উদাহরণ স্থাপন করে মানুষের নৈতিক আধ্যাত্মিক শক্তি অনুপাতে কুরআনের কথা ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে কার্যকর হয়। রসূলুল্লাহ্ সাঃ এর উম্মতি নবীর দ্বারা যা সম্ভব অন্য উম্মত দ্বারা তা সম্ভব নয়। রসূলুল্লাহ্ সাঃ এর নবীরূপ আধ্যাত্মিক সন্তানের দ্বারা দুনিয়া আবার অন্ধকার মুক্ত হবে। মানুষ তার মনুষত্ব ফিরে পাবে, ইসলামের নামে যে সব ভ্রান্তিও ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তাও মুছে যাবে। ঈমান সপ্তর্ষি মণ্ডলের 'আবাস' ছেড়ে ধূলির ধরায় তথা মানুষের মস্তিষ্কে, আচার আচরণে পুনবাসিত হবে তখন হয়ত অবক্ষয়ই সপ্তর্ষি মণ্ডলে পালাবার পথে খুঁজবে।

এর মাধ্যমেই দীনের পূর্ণাংগতা, অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ, ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করা সব কিছুরই সার্থকতাও খুঁজে পাওয়া যাবে, নতুবা এসব কিছুই ভাবরাজ্যে বিচরণ করে বেড়াবে। বাস্তবতা বর্জিত তথা কথিত অনুগামীরা এসবকে ভিত্তি করে কল্পনার ফানুস উড়াবে।

আমাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে আবারও হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ আঃ এর দাবীকে বিচার বিবেচনার আবেদন রাখছি। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হউন।

খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর সীরাতুন্নবী দিবস বিশ্বগ্রাসী অবক্ষয় রোধ করে মানুষকে কলুষতার মর্মবিদারী গ্লানী মুক্ত করে পবিত্রতায় ভূষিত করুন। সর্বশক্তিমান ও করুণাময়ের দ্বারে সে মিনতি রেখে আলোচনার ইতি টানছি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।

মৌলিক মানবাধিকার ঃ ইসলামী নীতির আলোকে

মানুষ জন্মগতভাবে এমন কতগুলো মৌলিক অধিকার লাভ করে যেগুলো সভ্য সমাজ কখনই লংঘন করতে পারে না। সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুযায়ী বিশেষ জরুরী অবস্থার ঘোষণা ব্যতীত রাষ্ট্রীয় সরকারও এগুলোকে স্থগিত করতে পারে না। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংবিধানে এই সকল মৌলিক মানবাধিকারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় এবং জাতিসংঘ পর্যায়ে ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্বেও আজ বিংশ শতাব্দীর এই মহা-সংকটময় মুহূর্তে অত্যন্ত দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহ এবং বিশ্ব-পরিস্থিতি কতকগুলো সংকীর্ণ স্বার্থ এবং বস্তুবাদীতার জটাজালে এমন ভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, পৃথিবীর কোনে কোনে অগণিত লোক বঞ্চিত, নিপীড়িত এবং মর্যাদাহীন জীবন যাপণ করছে, মৌলিক চাহিদা এবং অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক এবং জাতিসংঘের ঘোষণাবলী নিরবে-নিভৃতে কাঁদছে। দেশে-দেশে অগণিত লোক চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। দরিদ্র, দুর্বল, অসহায় মানুষের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলছে। বর্ণবাদ, বৈষম্যবাদ এবং শ্রেণী-বৈষম্যের লেলিহান শিখা জ্বলছে। অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিষ্ঠুর এবং নির্মম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, নারী-নির্যাতন, অনাথ-এতীম ও অসহায় শিশুদের চরম দুর্দশা এবং অপব্যবহার, কৃষ্টি ও কালচারের নামে নৈতিকতার চরম অধঃপতন। কোনে কোনে অঞ্চলে অঞ্চলে চলছে স্বৈরাচারী দুঃশাসন, বংশগত রাজতন্ত্র, রাজনৈতিক কলহ-কোন্দল। ফলশ্রুতিতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক উন্নয়ন ও বিকাশ হচ্ছে বাধাগ্রস্থ, স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবী হচ্ছে চরমভাবে অবহেলিত। একদিকে মৌলিক চাহিদার অভাবে ভুগছে অনুন্নত অঞ্চলের অগণিত অধিবাসী, অন্যদিকে কল্পনাতীত প্রাচুর্যের যুপকাষ্ঠে নৈতিকতা এবং মানবতাকে দিতে হচ্ছে চরম মূল্য। পৃথিবী আজ গগ্ ও মেগগ্ তথা ইয়াজুজ ও মাজুজের পরাশক্তির অধীনে জোটভুক্ত হয়ে চলেছে এবং সেই সংগে আকাশে বাতাসে অনুরণিত হচ্ছে দানবীয় মারণাস্ত্রের দাপট, আঞ্চলিক যুদ্ধের কোলাহল এবং মহাকাশব্যাপী পরিব্যাপ্ত বিভিষীকাময় তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পাঁয়তারা।

তাই আজ মানবতার সার্বিক স্বার্থে, বিশ্ব-মানবের কল্যাণ, শান্তি ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এবং উত্তেজনা-মুক্ত নিরাপদ বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে অবশ্যই কার্যকর এবং শাশ্বত পন্থা খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের আন্তরিকতাপূর্ণ দাবী এবং যুক্তি জ্ঞান ও নিদর্শন-ভিত্তিক ঘোষণা এই যে, শান্তিবাদী, সাম্যবাদী এবং মানবতাবাদী ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং

পুনঃপ্রয়োগের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে বর্তমান বিশ্বের জটিল সমস্যাবলীর সমাধান এবং মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। পবিত্র কুরআন সার্বিকভাবে অধিকারসমূহকে দুইভাগে ভাগ করেছে: (ক) 'হাক্কুল্লাহ' (আল্লাহ্‌র অধিকার) এবং (খ) হুকুকুল 'ইবাদ' (মানুষের অধিকার)। পবিত্র কুরআনে এই দু'টি বিষয়ের সংগে সম্পৃক্ত নীতিগত দিক সমূহের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে এবং হযরত নবী করীম (সাঃ-এর জীবনাদর্শের দ্বারা সেগুলির বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত হয়েছে। তাই একদিকে যেমন ইসলামী 'ইবাদত সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আদর্শ স্থাপিত হয়েছে, তেমনি ভাবে অন্যদিকে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মৌলিক অধিকার এবং দায়িত্বাবলী সম্পর্কেও ইসলাম পরিপূর্ণ শিক্ষা পেশ করেছে। এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে মুখ্যতঃ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নীতির আলোকে মৌলিক মানবাধিকার সম্পর্কে সংক্ষেপে নীচে উল্লেখ করা হলো:—

আজ হতে চৌদ্দশত বছর পূর্বে 'বিশ্বের কল্যাণ' হিসেবে আবির্ভূত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বিশ্ব-মানবের মৌলিক অধিকার সমূহের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন, সেগুলো বাস্তব ক্ষেত্রে সংরক্ষন করেছেন এবং ইসলামী খিলাফত-ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলির অব্যাহত নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। মানব জাতির পূর্ণরূপে পথ-প্রদর্শনের সার্বিক লক্ষ্যে এবং সকল নবী রসূলের আবির্ভাবের মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে 'খাতামান্নাবীঈন বলে ঘোষণা করেছেন (সূরা আহ্‌যাব: ৪১)। অন্যদিকে বিশ্বের সকল বঞ্চিত, দুর্দশা-পীড়িত, আর্ত-নিপীড়িত মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং মর্যাদাপূর্ণ বাঁচার অধিকার প্রদানের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে 'রহমাতুল্লীল আলামীন' তথা বিশ্ব-কল্যাণ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন (সূরা আম্বিয়া: ১০৮)। তাই এই মহা-মানবের আবির্ভাবে আমরা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারি: "খাতামান্নাবীঈন-যিন্দাবাদ, ইনসানিয়াত যিন্দাবাদ।"

১। জীবন ধারণ ও বাঁচার মৌলিক অধিকার:

মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তার জীবন ধারণ ও বাঁচার মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং জীবনের নিরাপত্তার প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হলো এই যে, সকল মানুষের জীবনের গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে এবং বিশেষ মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সূরা মু'মিনুন: ১১৬, যারিয়াত: ৫৭)। সকল সৃষ্ট-জীবের মধ্যে উৎকৃষ্টতম উপাদানে তাকে তৈরী করা হয়েছে এবং সে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা দ্বারা ভূষিত হয়েছে (সূরা ত্বীন, বনী ইস্রাঈল: ৭১)। আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবে ঐশী-গুণাবলীর প্রতিফলনের জন্যই মানব-জীবন (সূরা ফাতির: ৪০)।

দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তান-সন্ততিকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, ন্যায়-সঙ্গত কারণ ব্যতীত মানুষকে হত্যা করা নিষিদ্ধ—কেননা মানুষের জীবন এবং বাঁচার অধিকার রয়েছে। (সূরা আন'আম : ১৫২, বনী-ইস্রাঈলঃ ৩২)।

বিদায় হজ্জের ভাষণে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন : "মনে রেখো, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সম্মানকে আল্লাহ্‌তা'লা পবিত্র বলে ঘোষণা করেছেন।" (বুখারী)।

২। অনাথ এবং এতীমদের মৌলিক অধিকার ঃ

অনাথ-এতীমদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো এই যে, তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে, তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃ-সুলভ ব্যবহার করতে হবে এবং তাদের প্রতি বিশেষ-ভাবে দয়া এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। (সূরা বাকারা : ২২১, ফজর : ১৮-২০, মাউন)।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন : "যে বাড়িতে এতীমদের সংগে সদ্ব্যবহার করা হয় সেটা সর্বাপেক্ষা উত্তম বাড়ী এবং যে বাড়ীতে এতীমদের সংগে দুর্ব্যবহার করা হয় তা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বাড়ী" (ইবনে মাজাহ্‌)।

৩। দাসত্ব এবং দাস-ব্যবসার অবলুপ্তি ঃ

ইসলামই সর্ব প্রথম প্রচলিত দাস-প্রথাকে উচ্ছেদের ঘোষণা করেছে এবং ক্রীতদাস ব্যবসার অবলুপ্তির জন্য বাস্তবানুগ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ হলো এই যে, নিয়মিত যুদ্ধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দাস হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না এবং নিয়মানুযায়ী 'মুক্তি-পণ' আদায় করার পর যুদ্ধ-বন্দীরা মুক্তিলাভ করতে পারে (সূরা মুহাম্মাদ : ৫)। যুদ্ধ-বন্দী দাসগণ নির্ধারিত শ্রমের বিনিময়ে তাদের মুক্তির অধিকার পাবে (সূরা নূর : ৩৪)

বদরের যুদ্ধের পর 'মুক্তিপণ' নিয়ে যুদ্ধ-বন্দীদের অনেককেই মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে এবং যারা 'মুক্তিপণ' দিতে পারে নাই তারা মুসলমানদের লেখাপড়া শেখানোর বিনিময়েও মুক্তি পেয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীতে উচ্চ মর্যাদা এবং পদের অধিকারী হয়েছে এবং বিয়ে-শাদী ইত্যাদি সামাজিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করেছে।

৪। গৃহের নিরাপত্তা ও নারী জাতির মৌলিক অধিকার ঃ

গৃহের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ : অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করা যাবে না; নির্ধারিত গণ্ডীর বাইরে এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতা ব্যতীত নারীগণ বাইরে যাবে না (সূরা নূর : ২৮-৩২)।

নারী জাতির মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সার্বিকভাবে মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ই সমান (সূরা আলে ইমরান : ১৯৬, নিসা : ১২৫, নাহ্‌ল : ৯৮)। সেই সংগে সন্তান প্রতিপালন এবং আনুসঙ্গিক কারণে নারীকে পুরুষের অভিভাবকত্বে রাখা হয়েছে এবং রুযী-রোযগারের সংস্থানের দায়িত্ব মূলতঃ পুরুষের উপরে বর্তানো হয়েছে (সূরা নিসা : ৩৫)।

পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পারিক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য, সম্পত্তির অধিকার, মোহরানা, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে (সূরা নিসা, বাকারা : ২২৯)

প্রাচীনকালের প্রচলিত নিয়ন্ত্রণহীন বহু-বিবাহের পরিবর্তে ইসলাম কতকগুলো শর্ত সাপেক্ষে এবং প্রয়োজনবোধে সর্বাধিক চারটি পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে এবং প্রাসঙ্গিক শর্তাবলীর মধ্যে বিধবা ও এতীমদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই আদেশ নেওয়া হয়েছে, অন্যথায় একজন স্ত্রীই যথেষ্ট বলে শিক্ষা দিয়েছে (সূরা নিসা:৪)। স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই 'ত্বালাক' বা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে এবং তৎসংগে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুন আরোপ করা হয়েছে (সূরা বাকারা : ২২৮-২৪২)। বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনঃ বিবাহের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (সূরা বাকারা : ২৩৫-২৪১)। বৈবাহিক সম্পর্কের বহির্ভূত যৌন সম্পর্ককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং উহা হতে বাঁচার জন্য সতর্কতামূলক উপায় আবলম্বনের নির্দেশ করা হয়েছে (সূরা নিসা : ২৪-২৬, বনী ইস্রাঈল : ৩৩, নূর : ২৮-৩৪)।

হযরত রসূল করীম (সা:) বলেছেন : "হে আল্লাহ্, আমি দু'ধরনের দুর্বল লোকের অধিকারকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছি — তাদের একজন এতীম এবং অপরজন নারী" নিসায়ী)। বিদায় হজ্জের বাণীতেও এতীম, ক্রীতদাস এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা প্রদান করেছেন।

৫। পিতা-মাতা ও সন্তানের মৌলিক অধিকার :

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার প্রতি 'ইহ্‌সান' (মঙ্গল) করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে এবং 'শির্‌ক' ব্যতীত সকল ব্যাপারে পিতা-মাতাকে মান্য করতে হবে। (সূরা লুকমান : ১৫-১৬, বনী ইস্রাঈল : ২৪-২৫, আনকবুত : ৯)। পক্ষান্তরে সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহার, যথার্থভাবে লালন-পালন এবং সুশিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদানের নির্দেশ রয়েছে (সূরা আহ্‌কাফ : ১৬-১৮, তাহ্‌রীম : ৭, মু'মিন : ৫৯, শূ'আরা : ৮৪, ত্বা-হা : ১১৫)

হযরত রসূল করীম (সা:) বলেছেন : "যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে না এবং বড়দের অধিকার আদায় করে না তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।" (আবু দাউদ)

৬। আইনের দৃষ্টিতে সম-অধিকার এবং ন্যায়-বিচারের নিশ্চয়তা :

মানুষ মূলতঃ একই জাতি হতে উৎসারিত এবং কালক্রমে নানা গোত্র ও উপগোত্রে বিভক্ত হওয়ার কারণে তাদের মর্যাদার মাপকাঠি বংশ-পরিচয়, বাহ্যিক রূপ বা ধন সম্পদ দ্বারা নিরূপিত হতে পারে না--বরং প্রকৃত মর্যাদা তাঁর সৎকর্ম, তার 'তাক্‌ওয়া' ও খোদা-প্রেমের দ্বারাই নির্ণীত হবে (সূরা বাকারা : ২১৪, হুজুরাত : ১৪)। তাই শাসন ও বিচার

কার্যে নিয়োজিত প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সর্বাবস্থায় 'আদল' বা ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করতে এবং প্রত্যেককে পক্ষপাতিত্ব পরিহার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা নিসা : ৫৯, মায়দাহ্ : ৯)। পবিত্র কুরআনের নির্দেশ : "হে বিশ্বাসীগণ, ন্যায় বিচার পালনের ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন কর এবং আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দান কর—যদিও তা তোমাদের পিতা মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়।" (সূরা নিসা : ১৩৬)।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন : "হে আলী যখন দু'জন লোক বিচারের জন্য তোমার কাছে আগমন করে, তখন উভয় ব্যক্তির জবান-বন্দী না শুনা পর্যন্ত একজনকে রায় দিওনা। কারণ বিচার্য বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।" (তিরমিযী)। বিদায় হজ্জের পবিত্র সমাগমে তিনি মৌলিক মানবিক অধিকারের যে অমৃতবাণী ঘোষণা করেছিলেন তাতে মর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব এবং ন্যায়-বিচারের, সত্যিকার মহা-সনদ রচিত হয়েছে।

৭। সম্পদের মালিকানা এবং চুক্তির সম্পাদনের অধিকার ঃ

সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার প্রথম কথা হলো এই যে, সম্পদের প্রকৃত মালিকানা এবং কর্তৃত্ব খোদাতা'লার অধিকার-ভুক্ত এবং মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃজিত এই বিশ্ব-চরাচরে মানুষ শুধুমাত্র 'আমানতদার' (Trustee) হিসেবে নির্ধারিত নিয়ম কানুন পতিপালন সাপেক্ষে সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে (সূরা বাকারা : ৪০, যুমার : ৬০-৬৪, মা'রিজ : ৩৩, যুখরুফ : ৮৬, নিসা : ৬, ৫৯, আনফাল : ২৮ বাকারা ২৭৬)। সেই সংগে স্পষ্টতঃ ঘোষণা করা যয়েছে যে কোন অবস্থাতেই অবৈধ উপায়ে সম্পত্তি আহরণ করা নিষিদ্ধ (সূরা বাকারা : ১৮২-১৮৩ নিসা : ১১, ৩০, মায়ীদাহ্ : ৯১)। সম্পদ আদান প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে চুক্তি সম্পাদনের এবং উপযুক্ত স্বাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা বাকারা : ২৮৩)।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "সাবধান! তোমরা কারো উপর অত্যাচার করো না। কারো সম্পদ কেড়ে নেওয়া বৈধ নয়। কোন ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় তার সম্পদ অন্যকে দিয়া দেয় তবে সেটা ভিন্ন কথা।" (বায়হাকী)।

৮। সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মৌলিক অধিকার ঃ

সামাজিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক মৌলিক চাহিদা সমূহের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ইসলাম একদিকে অন্যায় ও অবৈধ উপায়ে অর্থোপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে, অন্যদিকে পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্থোপার্জনকে উৎসাহিত করেছে (সূরা হিজর : ৮৯, বাকারা ২০২, সাফ : ১২)। দ্বিতীয়তঃ দরিদ্র, অনাথ, অসহায় এবং অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উন্নায়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা বিশেষতঃ খাদ্য-বস্ত্র-আশ্রয়-স্বাস্থ্যের জন্য এবং শিক্ষার জন্য

যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (সূরা ত্বা-হা ঃ১১৯-১২০, নহল ঃ ৭২ মু'মিন ৫৯, যুমার ঃ ১১ এর আলোকে)। মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীব্যাপী যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ এবং খাদ্য সরবরাহ প্রসারিত রয়েছে (সূরা হামীম সাজদা ঃ ১১)।

ধনীদের সম্পদের মধ্যে দরিদ্রশ্রেণীর অধিকার রয়েছে এবং তা যাকাতের মাধ্যমে বণ্টনের সুব্যবস্থা করতে হবে এবং অন্যান্য দান খায়রাত ও সাদাকাতের নির্দেশ রয়েছে (সূরা বাকারা ঃ ৪, ১১১, ২৬২—২৭২)। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদত্ত সম্পদের দ্বারা পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ খিলাফতের পরিচালনাধীন বায়তুল মাল কর্তৃক সংগৃহীত করে তদ্বারা মানুষের সার্বিক কল্যাণের জন্য অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে (সূরা বাকারা ঃ ১৯৬ ও ২৭৪, হজ্ব ঃ ৭৯, তাওবা ঃ ৬০ এর আলোকে)।

বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) যাকাত ও অন্যান্য দান খায়রাত ছাড়াও নিয়মিত হারে চাঁদা এবং অসীয়ত পদ্ধতী অনুযায়ী অর্থ-সম্পদ প্রদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই অসীয়ত পদ্ধতির দ্বারা একদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-জনিত কঠোরতা এবং অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহের আত্মঘাতী অর্থ-নৈতিক প্রতিযোগীতার কবল হতে মানব জাতিকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

৯। চিন্তা, বিবেক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

আল্লাহ্‌তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন উৎকৃষ্ট উপাদানে এবং সে নীচাদপি নীচেও যেতে পারে, আবার বিশ্বাস ও সৎকর্ম দ্বারা মহা উন্নতি লাভ করতেও সক্ষম (সূরা ত্বীন) ইসলাম সর্বতোভাবে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষণা করেছে : "ধর্মে কোন জোর জবরদস্তি নাই, নিশ্চয়ই সত্যপথ এবং মিথ্যার মধ্যস্থিত ব্যবধান দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত" (সূরা বাকারা ঃ ২৫৭)। অনুরূপভাবে সত্যের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেওয়া বা না দেওয়ার জন্য মনুষকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। (সূরা কাহাফ ঃ ৩০)। আল্লাহ্‌তা'লার পথে জ্ঞান ও উত্তম যুক্তির মাধ্যমে আহ্বান জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (সূরা নাহ্‌ল ঃ ১২৬)।

অক্রান্ত এবং অত্যাচারিত অবস্থা ব্যতীত ইসলাম যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যে সকল যুদ্ধ করেছেন সেগুলো আত্মরক্ষামূলক এবং শত্রুপক্ষের সন্ধি-শর্তাবলী লংঘনের কারণে সংঘটিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা ঘোষণা করেছেন : "যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে শুধু তাদের জন্য যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং যাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে—আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম (সূরা হজ্জ ঃ ৪০)। যুদ্ধ চলাকালে আক্রমণকারীকে দৃঢ়তার সংগে প্রতিহত করতে হবে, কিন্তু সর্বাবস্থায় সীমালঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌তা'লা সীমালঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা : ১৯১-১৯৪)। সন্ধির প্রস্তাব করা হলে তা গ্রহণ করার জন্য ইসলামে নির্দেশ

রয়েছে (সূরা আনফাল : ৬২) এবং পারস্পরিক সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে (সূরা তাওবা : ৬—১৪১ ।

ইসলামের ইতিহাস একথার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে যে, নবুওয়াতের দাবী হতে শুরু করে হিজরত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১৩ তের বছর ছিল হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য চরম অত্যাচার এবং কষ্ট ভোগের সময়। দ্বিতীয়তঃ হিজরতের পর হতে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সময়ও ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যাচার ভোগের সময়—কারণ -সংখ্যা ও যুদ্ধ-উপকরণ উভয় দিক দিয়েই তাঁরা নগণ্য ছিলেন এবং এতদসত্বেও তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে। তৃতীয়তঃ হুদায়বিয়ার সন্ধি হতে মক্কা-বিজয় পর্যন্ত বিস্তৃত সময় ছিল শান্তি ও সন্ধির কাল। এই সময় ইহুদী ও অন্যান্য গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আত্মরক্ষামূলক সামরিক তৎপরতায় বাধ্য হয়ে নামতে হয়েছিল। ইতিহাস একথারও সাক্ষ্য বহন করছে যে, এই সকল পর্যায়ে একজন আরববাসীকেও তরবারীর দ্বারা মুসলমান করা হয় নি। ইসলামের নামে অথবা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারিত শক্তি প্রয়োগর অপবাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম দায়ী নয়, বরং সেই অপ প্রচারকারীগণের অজ্ঞতা এবং বিদ্বেষ-পরায়ণতাই দায়ী।

১০। জাতীয় অধিকার নির্বাচন ও মত-প্রকাশের অধিকার ঃ

ইসলাম পার্থিব ব্যাপারে শাসক ও শাসিতের অধিকার সম্পর্কে যথোপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেছে। শাসনকার্য পরিচালনার উপযুক্ত লোককে নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে (সূরা নিসা : ৫৯)। বংশগত রাজতন্ত্র এবং স্বৈরাচারী শাসন ইসলাম সমর্থিত নয়। শাসকের প্রতি নির্দেশ হলো তারা 'আদল' বা ন্যায়-বিচারের আদর্শকে সর্বাবস্থায় মেনে চলবে (সূরা নিসা : ৫৯, আনফাল : ২৮)। শাসিতদের জন্য নির্দেশ হলো তারা শাসকের আদেশ মেনে চলবে (সূরা নিসা : ৬০)। প্রত্যেকেই আমানত এবং অঙ্গীকারসমূহ মেনে চলতে হবে (মুমেনুন : ৯, মা'রিজ : ৩৩)। সার্বিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শাসন কার্যের বৃহত্তর কল্যাণের নিমিত্ত জনসাধারণ অথবা প্রতিনিধিদের সংগে পরামর্শ করা আবশ্যক । সূরা শূরা : ৩৯, আলে-ইমরান : ১৬০)।

পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী হযরত রসুল করীম (সাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশদীন কর্তৃক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। বুদ্ধি বিবেচনা এবং চেতনাবোধ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মত-প্রকাশের অধিকার রয়েছে (সূরা রা'দ : ১৬, কাহাফ : ৩০)।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেছেন : "তোমরা প্রত্যেকেই নিজ ক্ষেত্রে এক একজন শাসক এবং প্রত্যেককেই নিজ নিজ অধীনস্থদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

১১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার ঃ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি, শৃংখলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম সর্বপ্রথম সহন-শীলতার শিক্ষা প্রদান করেছে, পারস্পরিক সমঝোতা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসা করতে বলেছে। আলোচনা ব্যর্থ হলে সম্মিলিত ভাবে যুদ্ধের মাধ্যমে বিবাদ ও মত-বিরোধের মীমাংসা এবং ন্যায় বিচার করার জন্য সুষ্ঠু পদ্ধতির উদ্ভেখ করেছে। (সূরা হুজরাত : ১০)। মুসলিম সমাজের ঐক্য এবং সংহতির লক্ষ্যে পবিত্রকরণ ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে সকল কার্য সমাধা করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং খিলাফত ভিত্তিক সংগঠনের প্রতিশ্রুতি রয়েছে (সূরা নিসা : ৬০, আলে-ইমরান ১০৪-১০৬, নূর : ৭ম রুকূ)। আল্লাহ্‌তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন : "তোমরা আল্লাহ্‌র খাতিরে ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী হও এবং সেক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে 'আদল' ও 'ইনসাফ' বিসর্জনে প্ররোচিত না করতে পারে।" (সূরা মায়েদা : ৯)। বাস্তবক্ষেত্রে নমুনা হিসাবে মদীনার বিভিন্ন গোত্রের সংগে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য রচিত মদিনা চুক্তি, মক্কাবাসীদের সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি, নজরানের খৃষ্টানদের প্রতি এবং পার্শী ধর্মাবলম্বীদের প্রতি প্রদত্ত নিরাপত্তা সনদের শর্তাবলী প্রণিধান যোগ্য।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত নীতি-নির্ধারণী বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালিত হলে সহজেই যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের অবসান হতে পারে এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে।

উপসংহারে উল্লেখ করতে চাই যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল বিষয়ের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা এবং নির্দেশাবলী প্রদান করেছে এবং একথা অনস্বীকার্য যে এই সকল শিক্ষা এবং হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) এর আদর্শের বিশ্বব্যাপী পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যেই মৌলিক মানবাধিকারজনিত সমস্যাবলী সুষ্ঠু সমাধান নিহিত। বর্তমানে ইসলাম-নির্দেশিত খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সকল শিক্ষা ও নীতিমালা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে (সূরা নূর : ৭ম রুকূ দ্রষ্টব্য)। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফত ব্যতীত অন্য কোন প্রকার সংগঠন, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র অথবা জাতিসংঘের ঘোষণা দ্বারা কার্যকরভাবে মৌলিক মানবাধিকারগুলিকে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই ইসলামী খিলাফত-ভিত্তিক আহ্‌মদীয়া জামা'ত সত্যিকার ইসলামী নীতি ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে॥

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

আহ্‌মদের পিয়ালা করে
নয়া যিন্দেগী দান

মূল-উর্দু-হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ,
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)

আহ্‌মদ (সাঃ)-এর পিয়ালা করে
নয়া যিন্দেগী দান,
কত পিয়ারা এই আহ্‌মদ নাম!
এসে থাক যত নবী-ই,
নাহি আসে যায় কিছু,
সবার উপরে রয়;
আহ্‌মদ (সাঃ)-এর মুকাম।
আহ্‌মদের বাগ হ'তে
খেয়েছি আমি ফল,
মোর বুস্‌তান,
আহ্‌মদের কালাম।

ইবনে মরিয়মের যিক্‌র
দাও ছাড়ি'
তাঁর চেয়ে আফযল
আহ্‌মদ (সাঃ)-এর গোলাম।

অনুবাদে : ফারুক মীরপুরী

"সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥

(উর্দু দুর্‌রে সামীন)

মহানবী (সাঃ) ও মানবাধিকার

মহানবী (সাঃ) এর পূর্বেও যেমন মানবজাতি ছিল, তেমনি আজও আছে। আর যতদিন মানবজাতির অস্তিত্ব আছে ততদিন তাদের অধিকারের প্রশ্নও আছে। মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব কালে মানব সমাজ ছিল ধর্ম-কেন্দ্রীক। আর সেকালে বড় বড় ধর্মগুলিতে সকল মানুষের সম অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে অন্যেরা ছিল অত্যন্ত হীন, পশুতুল্য। ইসরাঈল ধর্মের দাবী হল, Thus says the Lord, Israel is my first born son অর্থাৎ ইহুদী ধর্মমতে একমাত্র ইসরাঈল জাতিই হল ঈশ্বরের বর-পুত্র। খৃষ্টান ধর্মে বিজাতীয়দেরকে বলা হয়েছে কুকুর (১৫ : ২২—২৬ পদ) শূকর (মথি, ৭ : ৬)। হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ব্রাহ্মণরাই ছিল সব কিছু। ব্রাহ্মণদের সেবাই ছিল অন্য বর্ণের জন্মের কারণ। ব্রাহ্মণোহস্য মুখ মাসীদ—অর্থাৎ—ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মার মুখ থেকে জাত। আর শূদ্র বেচারারা—পদভ্যা শূদ্রো অজায়ত (যজু, ৩১/১১ মন্ত্র) অর্থাৎ—শূদ্ররা পা থেকে উৎপন্ন। অতএব এই দুই বর্ণের সম্পর্ক ছিল মুখ ও পায়ের সম্পর্ক। তাই পা থেকে যারা জন্ম নিল তাদের ভাগ্যে ছিল শুধু পদ সেবা আর কারণে অকারণে পদদলিত হওয়া। শাস্ত্রের নির্দেশ, একমেবতু শূদ্রস্য প্রভু কর্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষা মন সূয়য়া (মনু, ১/৯১) অর্থাৎ—নিন্দা, ঈর্ষা, অভিমান পরিত্যাগ করে অপর তিন বর্ণের সেবা করতে হবে। হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মে দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ ইত্যাদি হয়ে জন্ম নেওয়াই হল পাপের ফল। বৌদ্ধ ধর্মেতো জন্মই পাপের ফল, যেমন খৃষ্টধর্মে মানুষ মাত্রই জন্মগত পাপী। আর ঠিক এমনি পরিবেশে নবী সম্রাট (সাঃ) এসে ঘোষণা করলেন, 'কানান্নাসু উম্মাতান ওয়াহিদাতান—সমগ্র মানবই এক জাতি। ওয়া ইন্না হাযিহি উম্মাতুকুম উম্মাতাউ ওয়াহিদাতান ওয়া আনা রব্বুকুম ফাত্তাকুন' (সূরা—মু'মিনুন)। মানুষ মাত্রই এক আর তার প্রভুও এক। 'ওয়া জায়া'লনাকুম শূউবাউঁ ওয়া কাবাইলা লিতা'আরাফ ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আতক্বাকুম'। অর্থাৎ—বিভিন্ন গোত্র এবং বংশের পরিচয়ের দ্বারা কেউ শ্রেষ্ঠ নয়, সেই শ্রেষ্ঠ যে কর্মে বা তাক্ওয়ায় শ্রেষ্ঠ।—(সূরা হুজুরাত)। 'ওয়া লাকাদ কার্রামা না বনি আদামা' (সূরা বনী ইসরাঈল) আদম সন্তান মাত্রই সম্মানিত। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'ইন্নাল্লাহা কাদ আযহাবা বিল ইসলামে আনকুম নাখওয়াতাল জাহেলিয়াতে ওয়া তাফাখুরাহুম বি আবায়েহিম ফান্নাছুলি আদামা ওয়া আদামু মিন তুরাব'। অর্থ—আল্লাহ্ অন্ধকার যুগের সকল প্রকার বংশ ও গোত্রগত মিথ্যা গর্ব ও অহংকার থেকে মানুষকে মুক্ত করেছেন। সবাই আদম থেকে আর আদমতো এই মাটিরই সন্তান। ধুলায় রচিত আদম তনয়, কিসের তার গর্ব। তিনি আরো বলেছেন, 'আন্নাছু সাওয়া সায়াতুন কা আসনানেল মুশতে লা ফাযলা লি আরাবীঈন আলা আজামীঈন ওয়ালা লী আবইয়াযা আলা আহ্মারা ইল্লা বিত তাক্ওয়া। অর্থাৎ—মানুষ পরস্পর চিরুণীর দানার মত সমান। অনারবের উপর

আরবের কিংবা লালের উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে যারা মুত্তাকী তারা ভিন্ন। কিং জনের ম্যাগনাকার্টা সনদ বলুন, সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পাদিত আটলান্টিক চার্টার বলুন, মহানবীর (সাঃ) এই ঘোষণার সামনে সবই ম্লান হয়ে যায়। আব্রাহাম লিংকন ১৮৪৮ সালে শিকাগোতে এবং ১৮৬৩ সালের ২৮শে নভেম্বর গেটিসবার্গে বলেছিলেন, "আমি এই আশা নিয়েই আপনাদেরকে ছেড়ে যাচ্ছি যে, স্বাধীনতার দীপ শিখা ততদিন পর্যন্ত আপনাদের অন্তরে থাকবে, যতদিন না এ সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহও সৃষ্টি হয় যে, সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান।" লিংকনের এই অরণ্যে রোদন আজো আমেরিকার আকাশে বাতাসে ব্যর্থতা নিয়ে বিরাজ করছে। এই বাণী বর্ণবাদী শ্বেতকায়দের কানের ভিতর দিয়ে এখনও মরমে পৌঁছেনি। এই আবেদনের দীর্ঘ একশত বৎসর পর ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের জেনারেল এসেম্বলীতে ত্রিশ দফার মানবাধিকার আইন ঘোষিত হয়। এর প্রথম দফায় আছে, All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. দ্বিতীয় দফায় আছে, Every one is entitled to all the rights and freedom set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as face, colour, sex, language, religion political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status—আজো প্রতি বৎসর ১০ই ডিসেম্বর আসে আর বিচারের এই বাণী কেঁদে কেঁদে সবার দ্বার থেকে নীরবে ফিরে চলে যায়। বলা হয়েছে জন্মগতভাবে জাতি বর্ণ, নর-নারী, ভাষা-ধর্ম ইত্যাদি সকল বিষয়েই সকল মানুষের সমান অধিকার। এখানে সংক্ষেপে এ নিয়ে ইসলামের আলোকে কিছুটা আলোকপাত করব। নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, কালো ধলো, আরব-অনারবে কোন পার্থক্য নেই। সবাই সমান। আল খালকু আয়ালুল্লাহ। সবাই এক আল্লাহ্‌র পরিবার। তিনি বলেছেন, ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম অর্থাৎ—আমিও তোমা-দেরই মত মানুষ। মানুষের প্রতি এর চাইতে বড় সম্মান আর হতে পারে না। তিনি অতিমানব হতে চাননি, অপরকেও অমানুষ বানাননি। তিনি সকল মানুষের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে মানুষেরই জ্ঞাতি হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। মনুর বিধানে দাস সাত প্রকার বলা হয়েছে। ধ্বজাদাস, ভক্তদাস, গৃহজ, দত্তদাস, ক্রীতদাস, দত্রিম এবং পৈত্রিক (৮/৪১৫)। মহানবী (সাঃ) এই দাস প্রথাকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে, শেষ বিচারে দিনে আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াব' (বোখারী) তিনি আরো বলেছেন, 'মুক্ত মানুষকে যে দাস বানায় তার নামায হয়না' (আবু দাউদ, তিরমিযী)। পবিত্র কুরআনের উনিশটি আয়াতে দাস মুক্তির কথা বলা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং ৬৩ জন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) ৬৭ জন দাস মুক্ত করেছেন। তেমনি অন্যান্য সাহাবীরাও (রাঃ) দাস মুক্ত করে পুণ্য সঞ্চয় করেছেন। একমাত্র আবদুর রহমান বিন আউফই (রাঃ) ত্রিশ হাজার দাস মুক্ত করেছেন।

নারী জাতি সম্বন্ধে তিনি ঘোষণা করেছেন—'ওয়া হুন্না মিসলুল্লাযি আলাই হিন্না বিল মা'রুফ (বাকারা)—নর ও নারীর অধিকার সমান। 'হুন্না লিবাসুল্লাকুম ওয়া আনতুম লিবাসুল্লা হুন্না' (বাকারা)—নর ও নারী একে অপরের আবরণ তুল্য। তিনি পিতা ও স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে নারীর অধিকার কায়েম করেছেন। বাইবেল বলে যীশু তাঁর মাকে বলেছিলেন, Woman! What shall I have to do with thee? (যোহন, ২ : ৪) তিনি তাঁর জননীকে মা না বলে "হে নারী" বলেছেন। অপর দিকে দয়াল নবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'আল জান্না'তু তাহ্‌তা আকদামে উম্মাহাতিকুম—মায়ের পায়ের তলে বেহেশ্‌ত অবস্থিত। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। ভাষার প্রশ্নে তিনি প্রচার করেছেন, ওমা আরসালনা মির রাসূলীন ইল্লাবিলিসানী ক্বাউমিহী—(সূরা ইব্রাহীম)। অর্থাৎ—প্রত্যেক নবীই তাঁর মাতৃ ভাষায় ঐশী বাণী প্রচার করেছেন। এর দ্বারা সকল ভাষাকেই সমান স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাছে কোন ভাষাই ম্লেচ্ছ নয়। ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নেই। 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন'—(সূরা বাকারা)। তাঁর উপর অবতীর্ণ বাণীতে আছে, 'ওয়া কুলিল হাক্কু মির রাব্বিকুম ফামান শায়া ফাল ইউমিন ওয়ামান শায়া ফাল ইয়াকফুর'—প্রভুর তরফ থেকে যে সত্য এসেছে তাতে যার ইচ্ছা বিশ্বাস অথবা অস্বীকার করুক। 'ইন্নাল্লাযিনা আমানু সুম্মা কাফারু সুম্মা আমানু সুম্মা কাফারু' (সূরা নিসা)—এখানে ধর্মত্যাগ অথবা গ্রহণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। রাশিয়ার শাসনতন্ত্রের ১২৪ ধারায় ধর্ম কর্মের স্বাধীনতা স্বীকার করলেও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। অবশ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার ও অপ-প্রচারের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। যথা—Freedom of religious worship and freedom of anti-religious propaganda is recognised for all citizens. একদিকে অন্যান্য ধর্মে এবং কমিউনিষ্ট শাসনে মানুষের অধিকার এবং অপর দিকে মহানবীর (সাঃ) আনীত শিক্ষাকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করলে দেখতে পাব যে, ইসলাম মানুষকে যে অধিকার দিয়েছে তা অপর কোন ধর্মমত বা ধর্মহীন ব্যবস্থা দিতে পারেনি। তাই জর্জ বার্ণাড শ' বলেছেন, I have studied him the wonderful man..... ...he must be called the saviour of humanity. I believe if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.

কবি গেয়েছেন—

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে জন,
এক আল্লাহ্‌ ছাড়া প্রভু নাই কহিল যে জন,
মানুষের লাগি চির দীন বেশ নিল যে জন,
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে জন,
এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী
ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি
আজি মাতিল বিশ্ব নিখিল মুক্তি কলরোলে।

—আলহাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

আদর্শ নবী হযরত রসূল করীম (সাঃ)

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة

অর্থাৎ, নিশ্চয় রসূল করীম (সাঃ)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে। মহা কবি আলতাফ হোসেন হালী তাঁর এক কবিতায় লিখেছেন,

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا — مرادیں غریبوں کی بر لانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا — وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا
فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوی — یتیموں کا والی غلاموں کا مولی

অর্থাৎ, তিনি নবীদের মধ্যে রহমতের খিতাবের অধিকারী, গরীবদের আশা পূরণকারী, বিপদের সময়ও পরোপকারী, আপন-পরের ব্যথায় তিনি ব্যথিত, ফকিরদের সাহায্যকারী, আশ্রয়স্থল দুর্বলের, এতিমদের আশ্রয়দাতা ও ক্রীতদাসদের বন্ধু।

সাধারণ নিয়মে বছরের প্রতিটি দিন একই ধরণের হয়ে থাকে। প্রতিদিনই সূর্য উদয় হয়, আবার আপন পথ অতিক্রম করে অস্ত যায়, কিন্তু কোন কোন দিনে এরূপ গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনার কারণ ঘটে যায় যার ফলে সেই দিনটি চিরস্মরণীয় ও বিশেষ সম্মানিত হয়ে থাকে, সেদিক থেকে (৯ই) ১২ই রবিউল আওয়ালের দিনটি ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র দিন। দিনটির তাৎপর্য ও ইতিহাস প্রত্যেকটি মুসলমানের হৃদয়ে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এইদিনে মাহ্‌বুবে খোদা, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এই দুনিয়াতে শুভাগমনের কারণে আল্লাহ্‌তা'লা একে কল্যাণ ও বরকতে ভূষিত করেছেন। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর জন্ম পৃথিবীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেননা তাঁর আগমনের ফলে পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের আবির্ভাব ঘটে এবং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয় যা অটল ও বিরল সত্যতার নিদর্শন দ্বারা ভরপুর এবং সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণ এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ শরী'অত। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাকারী স্বয়ং কুরআনের সমুদয় শিক্ষা নিজের জীবনে কার্যকরী করে দেখিয়েছেন। তাঁর জীবন কুরআনের শিক্ষার প্রতিমূর্তি ছিল যার সাক্ষ্য তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রাঃ) এইভাবে দিয়েছেন— كان خلقه القران অর্থাৎ রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবন কুরআনের ব্যাখ্যা ছিল। স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة অর্থাৎ নিশ্চয় এই রসূলের জীবনে তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট আদর্শ রয়েছে। এই আয়াতে হযরত রসূল করীম (সাঃ) এর সকল কথা কাজ ও তাঁর জীবনের সকল

অধ্যায় কে حسنة أسوة দু'টি পরিপূর্ণ শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যা শুধুমাত্র এই পবিত্র রসূল (সাঃ)-এর উপর যাবতীয় মর্যাদা সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি (সাঃ) ত্রুটিহীন জীবন ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যে ব্যক্তি কুরআনের ও ইসলামের যাবতীয় জ্ঞান অর্জন করতে চায় তার জন্য রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবন অনুসরণই যথেষ্ট। রসূল করীম (সাঃ)-এর ধর্ম ও যাবতীয় শিক্ষা সর্বকালের জন্য উপযোগী, তাঁর পবিত্র ধর্ম ও নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত শিক্ষা সমূহে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের কোন অবকাশ নেই। কুরআন মজীদ একমাত্র আসমানী কিতাব যা আদম সন্তানকে ইহ ও পরকালে মুক্তিদানে সমর্থ। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার এ এক মহান করুণা যে, তিনি পৃথিবীকে কুরআন রূপ এক পবিত্র ও অতুলনীয় বিধান দান করেছেন। রসূল করীম (সাঃ) নিজের জীবন দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, একমাত্র কুরআনই মানবজাতির সকল সমস্যা সমাধানে সক্ষম এবং ইসলামের শিক্ষা সমূহ প্রত্যেক দিক থেকে আমল করার উপযোগী। আজ পৃথিবীর মানুষ শান্তির জন্য ব্যাকুল, আজ মানবজাতি দারিদ্র দূরীকরণ, দুঃখ কষ্ট মোচন ও ন্যায় বিচার লাভের জন্য উন্মুখ। এ সকল সমস্যার সমাধান একমাত্র রসূল করীম (সাঃ)-এর আনীত বিধান অর্থাৎ কুরআনের শিক্ষার বাস্তবায়নেই সম্ভব।

আসুন আমরা নিকটতম দূরত্ব থেকে রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনকে বিশ্লেষণ করি যাতে তাঁর উচ্চ মুকাম ও মর্যাদা সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারি।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মানব জীবনের সকল স্তর অতিক্রম করে মানব জাতীর জন্য চির অনুসরণ যোগ্য আদর্শ রেখে গেছেন, বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তিনি মানব জাতির জন্য বিভিন্ন অবস্থার মোকাবেলা করার সে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। এতিম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে মক্কাতে মাতা পিতার স্নেহ হতে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ ও নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন, বকরী চড়িয়েছেন, ব্যাবসা করেছেন, যুবক হয়েছেন, বিবাহ করেছেন, সন্তানের অধিকারী হয়েছেন, জন্মভূমি হতে বিতাড়িত হয়েছেন, এক বিরাট জামা'তের ইমাম হয়েছেন, একজন বিজয়ী ও বিচারক হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র-বরকতময় জীবনে মানব জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের জন্য স্থায়ীআদর্শ রেখে গেছেন। এ সম্বন্ধে এক কবি লিখেছেন—

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری
آنچه همه دارند تو تنها داری

অর্থাৎ, ইউসুফ(আঃ)-এর সৌন্দর্য, ঈসা (আঃ)-এর দম, মূসা (আঃ)-এর সাদা হাতের নিদর্শন এই গুণ গুলি উপরোক্ত নবীদের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ছিল কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) একাই এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। কুরআন মজীদে নবী করীম (সাঃ) কে রহমাতুল্লীল আলামীন বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাঁর জীবনের ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত

হয় যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর চরিত্রে এ সমস্ত উত্তম গুণাবলীর পূর্ণ সমাবেশ ছিল। তিনি সর্বদা তাঁর অনুসারীদিগকে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য উপদেশ দিতেন এবং নিজেও সারা জীবন সকলকে স্নেহ ও ভালবেসে গিয়েছেন। কাউকে বিপদগ্রস্ত দেখে তার সাহায্যের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি শান্তি পেতেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি বিপদ মুক্ত না হত। পশু ও পাখিদের প্রতিও তিনি দয়া প্রদর্শনের জন্য নসিহত করতেন এবং সর্বদা তাদের আরামের দিকে লক্ষ্য রাখতেন। ধৈর্য ও ইস্তেকামাতের এক নযিরবিহীন দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। কুফ্‌ফারে মক্কা তাঁকে সর্বপ্রকারের দুঃখ ও কষ্ট দিয়েছে, তাঁর রাস্তায় কাঁটা বিছানো হয়েছে, তাঁর নিকটতম প্রিয়জনদেরকে বিভিন্ন প্রকারে নির্যাতন করা হয়েছে, তায়েফের দুষ্ট লোকেরা পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করে তাঁকে রক্তে রঞ্জিত করেছে, জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করা হয়েছে, প্রচারকার্যে সকল প্রকার বাধা প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ যুলুম ও অত্যাচারের সমস্ত পন্থাকে অবলম্বন করে তাঁকে নিপিড়ীত করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্‌র এই প্রিয় রসূল সর্বাঅবস্থায় ধৈর্য এবং দৃঢ়তার এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লা আপন অঙ্গীকার অনুযায়ী যখন তাঁকে দুনিয়ার বাদশাহ্‌ এবং মহা বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করলেন, তখন ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর সকল শত্রুদের প্রতি-শোধ নিতে পারতেন এবং এরূপ করা কোন অন্যায় হতো না। কিন্তু ক্ষমতার অধিকারী হয়েও তিনি ঘাতক শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিলেন। ক্ষমার এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নযীরবিহীন।

রসূল করীম (সাঃ) প্রকৃত মু'মিনের একটি গুণ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,---'সে তার ধর্মীয় ভাইয়ের সবদিক থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে'। এই গুণের বিকাশ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি আমরা দেখতে পাই। হিলফুল ফুযূলের সংগঠন এর প্রমাণ। রসূল করীম (সাঃ) মক্কার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তিনি কোন দৈহিক কাজ করতে সংকোচ বোধ করতেন না। অপরের বোঝা নিজের পিঠের উপর উঠিয়ে সাহায্য করেছেন, যিক্‌রে ইলাহীতে মগ্ন থাকতেন ও মানবজাতির সেবার চিন্তা করতেন। ধ্বংসোন্মুখ মানবজাতির জন্য এই মহা দয়াল নবী রাতের একটি বড় অংশ তাদের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য দো'আতে কাটাতেন। খোদার 'ইবাদতে এত মগ্ন থাকতেন যে সারা রাত দো'আয় রত থাকতেন এবং ফলে কখনও কখনও তাঁর পা ফুলে যেত। এক প্রাচ্যবিদ এ, জি, লিওনার্দ 'ইসলাম হার মরাল এ্যাণ্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালু' নামক পুস্তকে লিখেন :

"এই পৃথিবীতে যদি কোনো মানুষ খোদাতা'লাকে পেয়ে থাকেন, যদি কোন মানুষ সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্যে খোদাতা'লার 'ইবাদতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে থাকেন, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, আরবের নবী (সাঃ)-ই সেই ব্যক্তি।

মনুষ্য জাতির মধ্যে আজ পর্যন্ত যত মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর মধ্যে শুধু মহোত্তমই নন সাধুতমও বটে।"

আজকের মানবজাতি নৈতিক অবস্থার অধঃপতনের কারণে শঙ্কিত, আজ তারা শান্তির জন্য ব্যাকুল, দিশাহারা হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে এমন এক আশ্রয় যেখানে পাবে শান্তি ও পরম সুখ। আজ যদি দুনিয়ায় কোন ধর্ম থেকে থাকে, কোন আদর্শবান ব্যক্তি থেকে থাকেন যাকে অনুসরণ করে পাওয়া যেতে পারে পরম আত্ম-শান্তি, পরম সুখ, তাহলে সে ধর্ম হলো ইসলাম এবং সেই আদর্শবান ব্যক্তি হলেন ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত রসূল করীম (সাঃ)। এই কথা যে সত্য তার সাক্ষ্য দিয়েছেন বহু প্রাচ্যবীদ। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

এইচ, জে, রোস্তমজী, তার 'বার এ্যাট ল' নামক পুস্তকে লিখেছেন, "ইসলামের নবী (সাঃ) একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার পার্থক্য দূর করে মানবজাতিকে সত্যিকারের সাম্যের শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানুষের জীবনের সর্বস্তরেই পথ প্রদর্শনকারী, তিনি রাজন্যবর্গের মধ্যে রাজার চেয়েও বড় ছিলেন, এবং জনসাধারণের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ।"

টমাস কার্লাইল তাঁর এক পুস্তকে লিখেছেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ) ছিলেন সত্যতার এবং বিশ্বস্ততার একজন আদর্শ পুরুষ, বিশ্বস্ত তাঁর কর্মে, তাঁর কথায় এবং কাজে।"

ডাঃ হরদয়াল, এম, এ, পি-এইচ ডি, তাঁর এক পুস্তকে লিখেন, "এই মহাগুরুর (সাঃ) চরিত্র মানবতার একটি মহামূল্য সম্পদ।"

বসওয়ার্থ স্মীথ তার এক গ্রন্থে লিখেন, "মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শুধু সেই দাবীই করে গেছেন, যা তিনি প্রথম করেছিলেন। আমি বিশ্বাস করি যে, একদিন সবচেয়ে গভীর দর্শন এবং সবচেয়ে সত্য খৃষ্টান ধর্মও তাঁর নবী হওয়ার—খোদাতা'লার একজন সত্য নবী হওয়ার দাবীকে মেনে নিতে সম্মত হবে।"

আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদীন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লাম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

মাওলানা সালেহ্ আহ্‌মদ

মহান সীরাতুন্নাবী দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রাহকদেরকে জানাই মুবারকবাদ

ইউ নাইটেড মানেই ভাল চা

ইউনাইটেড টি কোং

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়
বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান

১০৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া

মহিলা অঙ্গন :

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের একটু ঝলক

আমাদের প্রিয় ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন এক মহাসমুদ্র। যাঁর সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে আমাদের প্রত্যেকের জন্য 'আদর্শ' হিসেবে ঘোষণা করেছেন যে :—

لقد كان لكم فى رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الا خر و ذكر الله كثيرا

যে তোমাদের জন্য 'আল্লাহ্‌র রসূলের চরিত্রে বা জীবনে উত্তম আদর্শ রয়েছে যে আল্লাহ্‌কে এবং ইয়াউমে আখেরাতকে পেতে চায় এবং আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী করে স্মরণ করে।

আমি কেবল নারী জাতির উপর তাঁর ইহ্‌সান ও মেহেরবানীর কথা বলব এবং তাঁর কতিপয় দো'আর দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অনুরোধ করব যে, আমরা যেন উঠতে বসতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সুন্নতকে সামনে রেখে সেমতে চলতে চেষ্টা করি এবং প্রতি মুহূর্তে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করে আল্লাহ্‌তা'লা ও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

بھیج درود تو اس محسن پردن میں سو سو بار
"پاک محمد مصطفےٰ نبیوں کا سردار"

اللهم صل على محمد و على ال محمد وبارك و سلم انك حميد مجيد

মাহে রবিউল আওয়াল আমাদেরকে আমাদের প্রিয় নবীর মুবারক আগমন ও আবির্ভাব ও মানব জাতির জন্য নতুন জীবন লাভের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মুসলিম দুনিয়াতে সবাই আনন্দে উছলে পড়ে। সে মহান ও "অতীব প্রসংশিত" মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতি হাজার হাজার সালাম॥

ছোট বেলা থেকেই আঁ-হযরত (সাঃ) আল্লাহ্‌তা'লাকে ভালবাসতেন। তন্ময় হয়ে ভাবতেন। একটু বড় হয়ে ধ্যান ও 'ইবাদতে রত থাকতেন গারে হেরা'তে। কয়েক দিন একাকী কাটাতেন ও স্রষ্টার 'ইবাদতে মগ্ন থাকতেন এবং আল্লাহ্‌তা'লার কাছেই তাঁর ভালবাসা ভিক্ষা করতেন :—

اللهم انى اسئلك حبك و حب من يحبك و حب من
يبلغنى حبه اليك و اجعل حبك احب الى من الماء البارد

অর্থ—হে আল্লাহ্‌। আমি তোমার নিকট তোমার মহব্বত কামনা করি এবং সেই ব্যক্তিরও মহব্বত কামনা করি যে তোমাকে মহব্বত করে এবং সেই ব্যক্তিরও মহব্বত কামনা করি

যার মহব্বত আমাকে তোমা পর্যন্ত পেঁৗছিয়ে দিতে পারে এবং তুমি তোমার মহব্বতকে সুশীতল পানি হইতেও প্রিয়তর করে দাও।

সকালে শয্যা ত্যাগ করবার পর থেকে জীবনের দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজে এবং রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্য্যন্ত নিজ খালিক ও মালিককে স্মরণ করতেন এবং দো'আ করতেন। এমনকি আয়না দেখেও দো'আ করতেন ঃ

"হে আল্লাহ্! তুমি আমার বাহ্যিক চেহারাকে যেমন নিখুঁত ও সুন্দর করেছ আমার মুখের (চেহারার) উপর জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দাও।"

হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে আমার বাহির দিক থেকে ভাল করে দাও এবং বাহিরটাকেও সুন্দর কর।"

ভোরে নামাযের পর দো'আ করতেন ঃ

"হে আল্লাহ্! আমাকে নূর দান কর। আলো দান কর আমার অন্তরে, আমার দৃষ্টিতে, আমার কর্ণে, আমার সামনে, আমার পিছনে, আমার ডানে ও আমার বামে। আলো দান কর আমার উর্দ্ধে এবং পদতলে। হে আল্লাহ্! আমাকে পুরোপুরী আলোকময় করে দাও।

তিনি নিজ জীবনের প্রতি পদক্ষেপ আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ করে তাঁর কাছেই সাহায্য ও শক্তি চেয়ে মানবকে পথের নির্দেশ দিলেন ঃ

"যে কাজের পূর্বে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়না সেটা ফলপ্রসূ হয়না।"

নারী জাতির প্রতি ভালবাসা ঃ—

আঁ-হযরত (সাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন ঃ—

خيركم خيركم لاهله ـ وانا خيركم لاهلى

তোমাদের মধ্যে সেই পুরুষ উত্তম যে নিজের পরিবারের জন্য উত্তম। এবং জেনে রেখো আমি আমার পরিবারের জন্য উত্তম। মেয়েদেরকে ভালবাসতেন এবং বলতেন ঃ

তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিষ আমার অতি প্রিয়—সুগন্ধি, নারী জাতি এবং আমার আসল শান্তি আমি নামাযে পেয়ে থাকি।

অবহেলিত নারী জাতিকে ধন্য করেছেন এই ঘোষণা করে ঃ

الجنة تحت اقدام امها تكم

তোমাদের মায়ের পায়ের তলায় জান্নাত। নারীকে মা রূপে এত মর্যাদা পূর্বে কেহ দেয়নি।

একদিন এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন "ইয়া রসূলুল্লাহ্! আমার সব চেয়ে ভাল ব্যবহার পাবার হক্‌দার কে? হুযূর (সাঃ) উত্তরে বল্লেন "তোমার মা" তিনি বললেন "তারপর"? বললেন 'তোমার ম'। তৃতীয়বারও বললেন 'তোমার মা'। চতুর্থবার সেই সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার পিতা"।

মেয়েদের সঙ্গে ভাল এবং নম্র ব্যবহার করার হুকুম বা আদেশ তিনি উম্মতকে দিয়ে গেছেন।

নিজ মহান জীবনে মাতৃস্থানীয়া দুধ মা হালীমাকে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান দেখিয়ে নিজের মাথার পাগড়ী বিছিয়ে আসন তৈরী করে বসতে আহ্বান করে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা শিখিয়ে গেছেন আমাদেরকে। নিজ স্ত্রী হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) এর প্রতি তাঁর (সাঃ) গভীর প্রীতি, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার ছিল।

প্রিয় কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ) কে তিনি স্নেহ ভালবাসা দিয়ে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কোন সফরে যাবার সময় কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-র সঙ্গে সব শেষে দেখা করতেন এবং ফিরে আসা মাত্রই তাঁর সাথে দেখা করা আঁ-হযরত (সাঃ) এর নিয়ম ছিল। উম্মতকে বলে গেছেন যে, যাকে আল্লাহ্ কন্যা দান করেছেন এবং সে তাকে শিক্ষা-দীক্ষা ও ভাল বিবাহ দিয়েছে তার জন্য জান্নাতের দরজা খোলা রয়েছে। আইয়্যামে জাহেলীয়াতের আরববাসীরা মেয়েদের খুব ঘৃণা করতঃ। কুরআন শরীফে আছে ঃ

واذا بشر احد هم بالا نثى
ظل وجهه مسودا و هو كظيم

অর্থ—এবং যখন তাদের মধ্য হতে কাউকে কন্যা সন্তানের (জন্মের) সংবাদ দেয়া হতো তখন তার মুখমণ্ডল কালিমা মণ্ডিত হয়ে যেত এবং সে (অন্তরে) ক্রোধ চাপতে থাকতো

এ হেন সমাজে আঁ-হযরত (সাঃ) আল্লাহ্ রহমানুর রাহীমের নির্দেশে নারীর পূর্ণ মর্যাদা কায়েম করে নারীর হক ও অধিকার দিয়ে গেছেন।

আল্লাহ্‌তা'লা হুযুর সাঃ এর মাধ্যমে মানব সমাজকে জ্ঞাত করলেন ঃ

ولهن مثل الذى عليهن

তোমাদের প্রতি স্ত্রীদের যেমন কর্তব্য রয়েছে স্ত্রীদের প্রতিও তোমাদের তেমনি দায়ীত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

স্বামী স্ত্রীকে একে অপরের পরিপূরক ও লেবাস (আবরণ) রূপে ঘোষণা করলেন ঃ

هن لباس لكم وانتم لباس لهن -

এত সুন্দর বাণী অন্য কোন ধর্মে পূর্বে অবতীর্ণ হয়নি। 'হাজ্জাতুল বিদা' বা শেষ হজ্জের ঐতিহাসিক খুত্‌বাতেও নারীর হক্ ও সম্মানের প্রতি মুসলমানদের সচেতন করতে আমাদের প্রিয় নবী ভুলেন নি! স্ত্রীরা তোমাদের দাসী বা বাঁদী নন, তোমরা আল্লাহ্‌তা'লাকে সাক্ষী রেখে তাদের গ্রহণ করেছ। তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে।

শেষ কথা

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পূর্বে পৃথিবীতে এমন কোন মহামানব জন্মগ্রহণ করেননি যিনি নারী জাতিকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা দান করেছেন। নারীকে ধ্বংসের অতল গহ্বর থেকে উঠিয়ে তাকে মাতার আসনে স্থান দিলেন। তিনি মাতার স্কন্ধে অর্পণ করলেন সন্তান-সন্ততি নির্মাতার দায়িত্ব। বললেন, 'হে মহীয়সী নারী! তুমি ইচ্ছা করলে গড়ে দিতে পার তোমার সন্তানের জান্নাত'। সুতরাং বোনদেরকে বলবো, আসুন আমরা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শিক্ষা, আদর্শ ও গুণাবলী নিজ জীবনে এবং সন্তান সন্ততির জীবনে ফুটিয়ে তোলার জিহাদে অংশ গ্রহণ করি, তবেই সীরাতুন নবী দিবস পালন সার্থক হবে। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে তওফিক দিন।

মাসুদা সামাদ

ইসলামের ভেরী

বাজিছে আজ ইসলামের ভেরী,
কেন তবে সবে করছ দেরী ?
মুসলিম রক্ত নাই ধমনীতে,
তাই কি আজ রয়েছ পড়ি ?
এ রণ তোমার যে সে রণ নয়,
কুফর ও ইসলামে হবে পরিচয়,
মুনাফিকের আজ পরখ হবে,
আরো কি পাবে এমন সময় ?
কে আছ আজিকে জীবন দিবে,
বিনিময়ে তার জান্নাত নিবে ?
অপন সত্বা বিকালো যারা
কে আছ এমন ফিরায়ে দিবে ?
মুসলিমের বাণী ফিরে নাকো জানি,
শুনে যা তোরা আল্লাহ্‌র কসম,
আল্লাহ্‌র কাজ করিবে আল্লাহ্,
তুমি শুধু দাও আপন জিসিম।
ঝাঁপাইয়া পড়িছে এ ঘোর আহবে,
দেখনা যতেক মুসলীম বীর,
ইসলামের তরে যুঝিছে তাহারা,
খলীফার আদেশে বিকালো শির।
ডাকিছে আজিকে খলীফা তোমারে
দাওনা নিজেরে কুরবান করি,
তোমার তরে এনেছে বারতা,
জান্নাতী জীবন "নূতন করি"।
এখনও যদি রহো পিছে পড়ি,
জীবনে মরণে দুকুল হারাবি,
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পারিবে সাধিতে,
ছেড়ে দাও সবি, নাজাত পাবি।
তুমি না আসিলে আছে কতজন,
পরোয়া যাহারা করে না কখন,
ইসলামের তরে সবি দিবে তারা,
কোথা তুমি রবে বলনা তখন ?

—বেগম মোস্লেমা সালাম

মানব দরদী রসূল (সাঃ)

আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, 'সিবগাতাল্লাহে' অর্থাৎ হে মানব মণ্ডলী! তোমরা আল্লাহ্‌তা'লার রঙে রঙীন হও, আল্লাহ্‌তা'লার গুণে গুণান্বিত হও। যে ব্যক্তি যতখানি আল্লাহ্‌তা'লার রঙে রঙীন হয়েছেন, তিনি ততখানি আল্লাহ্‌ওয়ালা মানুষে পরিণত হয়েছেন। তা'হলে আমাদের জানা দরকার আল্লাহ্‌তা'লার রঙ কি, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে কি কি গুণাবলী রয়েছে। গুণাবলীতো অসীম ও অনন্ত। তথাপি তাঁর অসীম ও অনন্ত গুণকে সূরা ফাতিহায় চারটি মৌলিক গুণের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। এই চারটি মৌলিক গুণের নাম রবুবীয়াত, রহমানীয়াত রহীমিয়াত ও মালিকীয়াত। এই চারটি মৌলিক গুণের বিশ্লেষণ করলে যে কেন্দ্রীয় ভাবটি আমা-মানষপটে ভেসে উঠে, তা হলো এই যে, আল্লাহ্‌তা'লা সর্বাধিক মানব-প্রেমিক ও মানব দরদী কেননা তিনিই আমাদের রব্ব্। তিনিই রহমান, তিনিই রহীম। তিনিই মালিক। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদেরকে এত ভালবাসেন যে, কোন মায়ের পক্ষেও তা সম্ভব নয়।

আল্লাহ্‌তা'লা উল্লেখিত চারটি মৌলিক গুণের বিশেষ অধিকারী হলেন তাঁর নবী রসূলগণ। নবী রসূলগণের মধ্যে আবার এই মৌলিক গুণের সর্বাপেক্ষা বেশী অধিকারী ছিলেন খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। তিনিই হলেন রহ্‌মাতুল্লীল আলামীন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন মানব জাতির প্রতি অসীম রহমতরূপে, দয়া ও প্রেমের সাগর রূপে। মানুষের জন্য এত দরদ, এত প্রেম, এত ভালবাসা অন্য কোন রসূলের মধ্যে ছিল না। অধিক তাত্বিক আলোচনায় না গিয়ে তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনা দৃষ্টান্ত স্বরূপ তুলে ধরলেই সম্যক উপলব্ধি করা যাবে যে, তিনি কত মানব দরদী ছিলেন। ইংরেজীতে বলা হয় Example is better than preeept (কথার চেয়ে আমল বড়)। এই মহা মানবের জীবনের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে কয়েকটি ঘটনা উপস্থাপন করা হলো ঃ

১। রসূল করীম (সাঃ) এর তায়েফ গমনের ঘটনা সর্বজন বিদিত। মক্কায় আল্লাহ্‌তা'লার তওহীদ প্রচার করার ব্যাপারে কিছুটা ব্যর্থ হয়ে তিনি তায়েফ নগরীতে গমন করেন। ভাবলেন তায়েফবাসী হয়তবা তাঁর কথায় কান দেবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার তওহীদের বাণী না শুনে তায়েফবাসীরা তাঁর উপর অমানবিক যুলুম অত্যাচার করলো। তারা পাথর নিক্ষেপ করে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহকে রক্তাক্ত করে দিল। আত্ম-রক্ষার্থে তিনি দ্রুতপদে তায়েফ ত্যাগ করেন। তিনি যখন তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছেন তখন আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে ফিরিশ্‌তা এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনি যদি চান তা'হলে এই যালিম শহরবাসীদিগকে আল্লাহ্ তাদের পাপের দরুন ধ্বংস করে দিবেন। তখন মানব দরদী রসূল (সাঃ)

আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে হাতজোড় করে বললেন, 'হে খোদা! তারা অজ্ঞ তাই আমার উপর যুলুম করেছে। তুমি এদেরকে ক্ষমা কর এবং হেদায়াত দাও। হে দরদী রসূল (সাঃ) সহস্র সালাম জানাই তোমাকে।

নবুওয়াত লাভের পর মক্কী জীবনে তিনি ও সাহাবীগণ যে পৈচাশিক যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তা কার না জানা আছে। আবু জাহ্‌ল ও আবু লাহাবের দল তাঁর (সাঃ) উপর জঘন্য শারিরীক নির্যাতন করেছিল। প্রায় তিন বৎসর তাঁকে ও সাহাবীগণকে নির্বাসিত জীবন যাপন করতে হয়েছিল। বহু নিরাপরাধ মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। অবশেষে তিনি যালিমদের যুলুম-নির্যাতনে প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে গেলেন। যেদিন তিনি মহা বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন, সেদিন মক্কাবাসীরা ভেবেছিল আজ নিশ্চয় তাদের নিস্তার নেই। তারা ভয়ানক শাস্তির প্রতীক্ষা করছিল। কিন্তু রহমাতুল্লীল আলামীন মানব দরদী রসূল সবাইকে অবাক করে দিয়ে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। তিনি বললেন, আজ যারা বিলালের পতাকার নীচে এসে দাঁড়াবে! তাদের সকলকে ক্ষমা করা হবে। মহান আল্লাহ্‌তা'লার রহিমীয়াত ও রহমানীয়াতের গুণে পরিপূর্ণরূপে গুণান্বিত না হলে এহেন সাধারণ ক্ষমা কি সম্ভব?

৩। এইতো সেই মানব-দরদী রসূল, যিনি বিচলিত চিত্তে এক ইহুদী শিশুকে তার মৃত্যু শয্যায় দেখতে যান এবং দরদ ভরা হৃদয়ে তাকে তওহীদের বাণী শুনান। এইতো সেই মানব-প্রেমিক রসূল, যিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে ঐ বৃদ্ধাকে দেখতে যান, যে তাঁর (সাঃ) পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। এইতো সেই রহমাতুল্লীল আলামীন, যিনি মানবতার সম্মানে ইহুদীর লাশ দেখে দাঁড়িয়ে যান। এইতো সেই ক্ষমাশীল রসূল, যাঁর মহান ক্ষমায় তাঁরই হন্তা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এই তো সেই পরম স্নেহময় রসূল, যাঁর অকৃতিম স্নেহের স্পর্শে পালিত পুত্র যায়েদ (রাঃ) স্বীয় পিতামাতার নিকট ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানায় এবং স্নেহময় রসূলের নিকট সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। এইতো সেই বাদশাহ্‌ রসূল, যিনি তাঁর সব কিছু গরীব দুঃখীকে দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় তাঁর পরম স্নেহময় প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লাখো সালাম তোমায় হে দরদী রসূল (সাঃ)! বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জামা'তের বর্ত্তমান ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয়, "আমাদের, আমাদের বাপ-দাদাদের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের এই ক্ষমতা নেই যে আমরা তাঁর (সাঃ) ঋণ শোধ করতে পারি।"

আক্ষেপ, আজ এই মহাপুরুষের চরিত্রে কালিমা লেপন করতে ইসলামের দুশমনেরা সর্ব প্রকার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় ইসলামের অন্যতম দুশমন মেজর আসবারণ তার "Islam under the Arab rule" পুস্তকে লেখেন যে, "যখন আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল তখন তিনি যে সকল নীতির

প্রস্তাব করেছিলেন ঐগুলোর মধ্যে একটি ইহা ছিল যে, ধর্মে কোন জবরদস্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু কৃতকার্যতার নেশা তাঁর (সাঃ) বিবেকের কণ্ঠকে (নাউযুবিল্লাহ্‌ মিন যালিক) অনেক পূর্বেই নিস্তব্ধ করে দিয়েছিল। এর ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, আরববাসীরা এক হাতে কুরআন এবং অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে শহরগুলোকে ধ্বংস করেছে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর সমূহের পরিবারগুলোর আর্তচিৎকারের মধ্যে নিজেদের ধর্ম প্রচার করেছে।"

আক্ষেপ! মানব-প্রেমিক রসূলের বিরুদ্ধে কতই না যালেমানা ও মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছে। এর চেয়েও অধিক আক্ষেপ এবং শত আক্ষেপ! আজ ইসলামের খ্যাতনামা মৌলবী মওদুদী সাহেব ইসলামের দুশমন মেজর আসবারণের দেয়া অপবাদই রসূল আকরাম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে এভাবে উপস্থাপন করছেন :—

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তের বৎসর পর্যন্ত আরববাসীকে ইসলামের আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে বিস্ময়কর মোজেযা প্রদর্শন করেন। তিনি সদাচার ও স্বীয় পবিত্র জীবন দ্বারা পুণ্যের সেরা আদর্শ পেশ করেন। কিন্তু তাঁর সকল ওয়ায-নসিহত ব্যর্থ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি (সাঃ) যখন তলোয়ার হাতে নিলেন তখন মানুষের মন হতে ক্রমে ক্রমে পাপ ও দুস্কৃতির কালিমা দূর হতে লাগলো। তাদের মনের গ্লানি পরিস্কার হয়ে গেল।"

(আল জিহাদ ফিল ইসলাম ১৩৭-১৩৮পৃষ্ঠা)

হায়, মহামানবের পূত পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে কি জঘন্য অপবাদ! রসূল আকরাম (সাঃ) নিশ্চয় যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু কেন করেছিলেন? সূরা হজ্জে আল্লাহ্‌তা'লা কেবলমাত্র ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন, যারা বিনা কারণে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করে এবং মু'মিনদেরকে তাদের গৃহ হতে ও মাতৃভূমি হতে বের করে দেয়, আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বলপূর্বক নিজেদের ধর্মে প্রবেশ করায় ও ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চায় এবং লোকদিগকে মুসলমান হতে বাধা দেয়। কুরআন করীমের এই নির্দেশের আলোকেই রসূল আকরাম (সাঃ) কে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। বরং বলা যায়, যুদ্ধ তাঁর উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি কোন যালেমানা যুদ্ধ করেননি। তলোয়ার দিয়ে তিনি মানব-হৃদয় জয় করেন নি (জোর করা সম্ভবও নয়)। মানব জাতির প্রতি তাঁর প্রেম-ভালবাসা ও তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি তাদের হৃদয়কে জয় করেছিল। এক মহান বিপ্লব তিনি সংঘটিত করেছিলেন। কিন্তু ইহা কোন্‌ বিপ্লব ছিল? এই বিপ্লব সম্বন্ধে আহ্‌মদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) বলেন :—

"আরবের মরুভূমিতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ মৃত ব্যক্তি অল্প কিছু দিনের মধ্যেই জীবিত হয়ে গেল। অতীতের বিকৃত মানুষগুলো খোদার রঙে রঙীন হয়ে গেল। অন্ধরা চক্ষুষ্মান হলো। মূকদের কণ্ঠে খোদার তত্বজ্ঞান জারী হলো। পৃথিবীতে

একবারই এরূপ বিপ্লব ঘটলো। পূর্বে না কেহ ইহা দেখেছে, না কেহ ইহা শুনেছে। তোমরা কি জান, এই বিপ্লব কি ছিল? ইহা একজন 'ফানা-ফিল্লাহ্‌'র অন্ধকার গভীর রাতির দো'আই তো ছিল। তিনি পৃথিবীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন এবং ঐ অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেন, যা এই নিরক্ষর অসহায় ব্যক্তির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল।" (বারাকাতুত্‌ দো'আ)

প্রবন্ধের কলেবর আর বাড়াতে চাই নে। আসুন, আমরা বাংলাদেশ লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র বোনেরা মানব দরদী রসূল রহমাতুল্লীল আলামীন (সাঃ)-এর প্রতি সহস্র দরূদ প্রেরণ করি এবং আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে সজল নয়নে এই দো'আ করি, হে প্রভু! তোমার প্রিয় রসূলের রঙে আমাদেরকে রঙীন করে দাও এবং তোমার রঙে আমাদেরকে রঙীন করে দাও এবং বাংলাদেশের সকল বোনকে তোমার রঙে রঙীন হবার জন্যে ঐ বিপ্লব করার তওফিক দান কর, যে বিপ্লব আজ থেকে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সংঘটিত করেছিলেন আমাদের প্রাণ প্রিয় রসূল খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। আমীন।

—রোকেয়া আহ্‌মদ

পবিত্র সীরাতুন্নাবী দিবস উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রাহকদের জানাই মুবারকবাদ

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

Love For All Hatred For None

—হযরত খলীফ তুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিস্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ— এইচ, পি, বি, ল্যাবরেটরীজ লিঃ

পরিবেশক ঃ— হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা

১নং আব্দুল গনি রোড,

জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯ ঢাকা-১০০০ ফোন ঃ ২৪.২৯০

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর শাসন ব্যবস্থা

নবী-কুল শিরোমনী বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব, সাইয়্যেদুল মুরসালীন, রহমাতুলীল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বকালের সর্ব যুগের আদর্শ স্থানীয়। ইসলামের সার্থক রূপায়ণ লাভ করেছিল তাঁরই পূত পবিত্র পূর্ণাঙ্গীন জীবনে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রেরিত পবিত্র গ্রন্থ কুরআন করীমে ঘোষণা করেছেন--"লাকাদ কানা লাকুম ফী রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানাহ্"—অর্থাৎ তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্বে ধরাধামে আগমনের পর বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ্-তা'লার প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে মহানবী (সাঃ) বিশ্বব্যাপী এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীকে বর্ণ, বংশ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ এক ও অবিচ্ছেদ্য —এই বলিষ্ঠ নীতি অবলম্বনের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি এ কথাও ঘোষণা করেন—"আনা বাশারুম মিস্লুকুম"—অর্থাৎ আমি তোমাদের মতোই মানুষ। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন সর্বজন স্বীকৃত এ মহামানব নিজেকে আমাদের মতোই একজন মানুষ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি মানুষ মুহাম্মদ (সাঃ) হয়েও বিশেষ বিশেষ গুণের কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। কেননা একজন মানুষের মধ্যে এত অধিক গুণের সমাবেশ পৃথিবীর আর কোন মানুষের মধ্যে আজ অবধি দেখা যায়নি।

মানবীয় সকল গুণের মধ্যে শাসক হিসাবেও রসূলে পাক (সাঃ) দুনিয়ার বুকে এক নূতন ধারা প্রবাহিত করেন। মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পরই শুরু হয় তাঁর রাষ্ট্র নায়কের জীবন। ৬২২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করার পর থেকেই হিজরী সন গণনা শুরু হয়। মদীনার পূর্ব নাম ছিল 'ইয়াসরিব'। হুযুর আকদাস (সাঃ)এর সম্মানার্থে এর নাম রাখা হয় 'মদীনাতুন নবী' বা নবীর শহর। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর খানে আসার পর প্রথমে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, এই নির্মাণ কার্যে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মসজিদে মুসলমানগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায সংঘবদ্ধ হয়ে (বা জামা'ত) আদায় করতেন। এই মসজিদই ছিল তাঁর শাসন কার্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মদীনায় হযরত শান্তিপূর্ণ ভাবে ইসলাম প্রচার কার্যে অগ্রসর হন, কালক্রমে অধিকাংশ মদীনাবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লাভ করেন এবং মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও ইসলাম ধর্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়।

মদীনাকে রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করার জন্য হুযুর আকদাস (সাঃ) প্রথমে এখানকার গোত্রীয় কলহ দূর করেন। কেননা সে সময়ে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত মদীনাবাসীগণ সর্বদা গোত্রীয় কলহে লিপ্ত থাকতো এবং গোত্রীয় পার্থক্য হেতু কূটনৈতিক শত্রুতা, উদ্বেগ ও সংশয়ের মধ্যে কালাতিপাত করতো। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) গোত্রীয় কলহ ও পার্থক্য

দুর করার জন্য সকলকে আনসার বা সাহায্যকারী হিসাবে একই শ্রেণীভুক্ত করলেন। এই ভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর সংগে মদীনায় আগমনকারীগণ হলেন 'মুহাজিরীন।' এদের উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি করলেন সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ববন্ধন। রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায়ের সহযোগীতা ও সমর্থন লাভের জন্য অন্য সকল ধর্মের প্রতি তিনি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ইসলামী প্রজাতন্ত্র দৃঢ়ভাবে গঠন করার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন যে 'নিজে বাঁচ এবং অপরকেও বাঁচতে দাও।' মদীনায় বসবাসরত সকল সম্প্রদায়ের সাথে সম্প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে এক সন্ধি পত্র বা সনদ সম্পাদন করেন। ইহাই 'মদীনা সনদ' নামে পরিচিত। এই সনদই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত রাষ্ট্রের জন্য প্রথম লিখিত সংবিধান। সন্ধি পত্রের প্রধান শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায় সমূহ একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে।

(২) যদি এদের কেউ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে অন্যরা মিলিত শক্তি দ্বারা তাদের সাহায্য করবে।

(৩) কেউ কুরাইশদের সাথে কোন প্রকার গোপন সন্ধি করতে পারবে না, বা মদীনা বাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কুরাইশদের সাহায্য করতে পারবে না।

(৪) মুসলমান, ইহুদী এবং অন্যান্য সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম কর্ম পালন করবে, কেউ কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

(৫) কোন অমুসলমানের ব্যক্তিগত অপরাধ হলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসাবেই বিচার করা হবে। সেজন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা চলবে না।

(৬) দুর্বলকে রক্ষা করতে হবে।

(৭) এখন হতে রক্তক্ষয়, হত্যা ও বলৎকার নিষিদ্ধ করা হলো।

(৮) আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে শাসক হিসাবে এরূপ লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই প্রথম করলেন। তাঁর পূর্বে আর কোন শাসক লিখিত শাসনতন্ত্র প্রদান করতে সক্ষম হননি। তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলেন যে দেশের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার মনোভাব বিশেষ প্রয়োজন। একাধারে তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক এবং সুযোগ্য পরিচালক। উইলিয়াম মূর (Muir) বলেন যে, তাঁর লিখিত সংবিধান প্রণয়ন দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে—"হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব মননশীলতা তৎকালীন যুগের নয়, বরং সর্ব যুগের ও সর্বকালের মহামানবের জন্য শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।"

মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর রসূল করীম (সাঃ) হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ইসলামী সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে যে, ব্যাখ্যা তা এই যে,— আল্লাহ্‌তা'লাই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী

তাঁর এমনই শক্তি যেখানে কারো কোন হাত নেই। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। তিনি মানুষকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে সৃষ্টি করে তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে পবিত্র 'ক্বুরআন' নাযিল করেছেন। ইসলামের পথ প্রদর্শক ও বিধান হল পবিত্র 'ক্বুরআন মজীদ'। ইহা এমন কতগুলি বাণীর সমাবেশ যাতে সেই সর্বশক্তিমান মহান প্রভুর আদেশ নিষেধ লিপিবদ্ধ রয়েছে। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের মধ্যে সে সব বিধি বিধানের প্রতিফলন ঘটানো এবং উহার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাঁরই প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে আল্লাহ্‌তা'লা পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌তা'লা রসূল করীম (সাঃ) কে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করেছিলেন। অপরদিকে বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হব্‌স, বেদিন, অর্টিন প্রমুখের সংজ্ঞানুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহ্‌তা'লার পরেই বিদ্যমান ছিল। কারণ নবী হওয়া সত্বেও তিনি মদীনা রাষ্ট্র কায়েম করেন এবং এর শাসনভার নিজ হাতে তুলে নেন। শাসন কার্যের ব্যাপারে তিনি সব দিকেই ছিলেন সর্বময় কর্তা অর্থাৎ সর্বেসর্বা। নিজের উপরে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়েছেন বিশ্বের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনকে। আল্লাহতা'লার প্রতি তাঁর এ আনুগত্য প্রকাশের কারণে কোন অংশেই মানব-শাসক হিসাবে তাঁর সার্বভৌমত্ব খর্ব হয়নি।

শাসনের ব্যাপারে হযরত (সাঃ) কর্তৃক প্রণীত বিধান চরম বলে গণ্য হওয়া সত্বেও তিনি ক্বুরআনের বিধান মোতাবেক সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার প্রধান জ্ঞানী সাহাবীগণের সম্মিলিত মতামত গ্রহণ করতেন। নবী হয়েও তিনি ছিলেন আইন প্রণেতা, সেনানায়ক, প্রধান বিচারক ও রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক। ক্বুরআনের আলোকে সামাজিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রনয়ণ করে তিনি তা কার্যকরী করতেন। সামরিক বাহিনী গঠন করে তা পরিচালনা করতেন এবং ভূখণ্ড দখল করে তা শাসন করতেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কার্যালয় ছিল 'মসজিদে নব্‌বী'। অধিকাংশ শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারই এখানে সম্পন্ন করতেন। এ সব কার্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—বিভিন্ন গোত্রের নিকট পত্র প্রেরণ, চুক্তি সম্পাদন, গভর্ণর বা প্রাদেশিক শাসন কর্তাদের ও কর আদায়কারীদের উপর আদেশ জারী প্রভৃতি। নবীজির (সাঃ) জীবদ্দশায় আর কোন দ্বিতীয় কার্যালয় স্থাপিত হয় নাই।

শাসন কার্য পরিচালনার জন্য নবীজির (সাঃ) কেন্দ্র ছিল মদীনা এবং দপ্তর 'মসজিদে নব্‌বী'। তাঁর সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ছিল, যথা—আল্লাহ্‌র বাণী লিপিবদ্ধ করণ, ধন সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী যাকাত ও সদকা নির্ধারণ, অন্য দেশের রাজা, শাসক ও খৃষ্টান গণের মধ্যে পত্র বিনিময় এবং রাষ্ট্রের আয়ের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করণ। এই সব বিভাগের দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োজিত ছিলেন। হযরত 'উসমান (রাঃ) ও

হযরত আলী (রাঃ) উভয়ে অহী বা প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ করতেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে এ দায়িত্ব পালন করতেন উবাই-বিন-কাব ও যায়িদ-বিন-সাবিত। যাকাত ও সদকার হিসাব এবং সংগৃহিত সম্পত্তির নথিপত্র সংরক্ষণ করতেন যোবায়ের ও শোহায়েম (রাঃ), খেজুর হতে প্রাপ্ত রাজস্বের হিসাব তৈয়ার করতেন ছোয়ায়ফাবিন-ইয়ামান (রাঃ)। জনসংযোগ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন মুগীরা-বিন-শোরা এবং হাসান-বিন-নাসির (রাঃ)। বিভিন্ন গোত্রের পুরুষ, মহিলা এবং আনসারগণের হিসাব রক্ষণ ও তাঁদের পানীয় জলের ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করতেন আবদুল্লাহ্-বিন-আকরাম এবং আল্ আলা-বিন-উক্‌বাহ (রাঃ)। অন্যান্য দেশের নাগরিক ও সেনাপতিদের কাছে প্রেরিত পত্রের খসড়া প্রস্তুত করতেন যায়েদ-বিন-সাবিত (রাঃ)। কোন কোন সময় এ কাজ সম্পাদন করতেন আবী-বিন-আবী আব্বাস (রাঃ)। রাষ্ট্রের আয়ের হিসাব রাখতেন মুকিব-বিন-আতিমা (রাঃ)। নবীজির ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন আনযালা-বিন-রাবী (রাঃ) তাঁরই তত্ত্বাবধানে নবী করীম (সাঃ)-এর সিলমোহর ব্যবহৃত হত।

মদীনা ছিল নব গঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী। শহর ও উহার নিকটবর্তী এলাকাগুলি প্রত্যক্ষ ভাবে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শাসনাধীনে ছিল। সমগ্র আরব দেশকে একতাবদ্ধ করবার পর হযরত (সাঃ) প্রাচীন ইতিহাস ও ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কার্যের সুবিধার জন্য উহাকে কতিপয় প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রদেশগুলো হলো: (১) মদীনা (২) তায়মা (৩) আল নজ্‌দ (৪) বানুকিন্দা উপগোত্রের অঞ্চল (৫) মক্কা (৬) নজরান (৭) ইয়ামেন (৮) হাজরা মাউথ (৯) ওমান ও (১০) বাহ্‌রাইন।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে প্রাদেশিক গভর্ণর বা ওয়ালী নিযুক্ত করতেন। শাসন ব্যবস্থাকে এইভাবে বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দূরতম প্রদেশের সুষ্ঠু শাসনের নিরাপত্তা বিধান করা হতো। ওয়ালী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ প্রদেশের সর্বময় কর্মকর্তাই ছিলেন না তারা নিজ নিজ প্রদেশের আইন শৃংখলা রক্ষা এবং বিচার কার্যও পরিচালনা করতেন।

ওয়ালী বা গর্ভর্ণর ছাড়াও প্রত্যেক গোত্রীয় এলাকায় যাকাত এবং সাদকা আদায়ের জন্য নবীজি দঃ) আমীলদের (কর্মচারী) নিযুক্ত করতেন। আমীলগণ প্রত্যেকেই যাকাত আদায়ের কার্যে পারদর্শী ছিলেন। হুযুর আকদস (সাঃ) স্বয়ং তাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা দান করতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নিযুক্ত এরূপ প্রত্যেক কর্মচারীই ছিলেন চরিত্রবান ও সকল অভিযোগের উর্ধে।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) স্বয়ং রাজধানীতে (মদীনায়) অবস্থান করতেন এবং প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করতেন। প্রাদেশিক কাযীগণকে তিনি নিজেই নিযুক্ত করতেন বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণকে কাযী বা বিচারক নিযুক্তির আদেশ দিতেন। ধী-শক্তি

সম্পন্ন, সৎ এবং ন্যায় নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ জ্ঞানী, পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে তিনি কাযীরূপে নিযুক্ত করতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত 'আলী এবং মুয়াজ-বিন্-যাবেলের (রাঃ) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আয়ের উৎস ছিল ৫টি, যথা—(১) গণিমাত (২) যাকাত ও সাদকা (৩) জিজিয়া (৪) খারাজ (৫) আলফাঈ।

(১) **গণীমাত ঃ** যুদ্ধ ক্ষেত্রে বিধর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র, উট, ঘোড়া এবং অন্যান্য হস্তান্তর যোগ্য সম্পদ বিশেষ। ইহার অংশ যুদ্ধে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হতো, বাকী অংশ কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক অনাথ, অভাবী এবং মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যয় করা হতো।

(২) (ক) **যাকাত ঃ** নির্দিষ্ট সম্পদের উপরে ধার্যকৃত কর। শুধুমাত্র সামর্থ্যবান মুসলমানদের নিকট হতে আদায় করা হতো। ইহা উৎপাদিত ফসল, গৃহপালিত পশু, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বাণিজ্য দ্রব্যের উপর আরোপিত হতো। যাকাত হিসাবে যা আয় হতো তা ঋণগ্রস্থ গরীব, দুঃখী ও ক্রীতদাসদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।

(খ) **সাদকা ঃ** ইচ্ছাকৃত ভাবে দেয় কর। ধনীরা ইহা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতো।

(৩) **জিজিয়া ঃ** অমুসলমানদের নিকট হতে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আদায়কৃত কর। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির উপরে এক দীনার করে এ কর ধার্য করেন। কিন্তু স্ত্রীলোক, ভিক্ষুক এবং যাদের অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা ছিল না তারা এই কর হতে রেহাই পেত। এই কর দ্বারা আদায়কৃত অর্থ সৈন্যদের বেতন, কাপড়, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করা হতো।

(৪) **খারাজ ঃ** ভূমি বা জমির জন্য ধার্যকৃত কর খারাজ। জমিতে খারাজ হিসাবে যা আদায় করা হতো তা সামরিক বিভাগের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ব্যাপারে এ অর্থ খরচ করা হতো।

(৫) **আলফাঈ ঃ** রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে আদায়কৃত কর আলফাঈ। এই অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আত্মীয় স্বজন, এতিম, গরীব, ভ্রমণকারী এবং মুসলিম রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণে ব্যয় করা হতো।

নবীজির (সাঃ) সামরিক বিভাগ ছিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত। ছোট ছোট যুদ্ধাভিযানে একজন সেনাপতি বা আমীর প্রেরণ করা হতো। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিদের যুদ্ধ পরিচালনার অপূর্ব কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন। নবীজি (সাঃ) নিজেই সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন, তিনি স্বয়ং বদর, ওহুদ, হুনাইন এবং মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ পরিচালনা করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন, সৈন্যদের জন্য অবস্থানের স্থান নির্বাচন, পানীয় জলের ব্যবস্থা, অনুকূল আবহাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে যুদ্ধ করতেন।

শাসন কার্য পরিচালনার সাথে সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ইসলাম প্রচারের কাজও করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য ইসলামের পয়গাম দিয়ে বিভিন্ন স্থানে দূত প্রেরণ করেন। নিজে তিনি ধর্ম শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকতা করেন। সে জন্য সমগ্র মদীনাতে ১০টি মসজিদ ছিল। বিভিন্ন এলাকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মসজিদে নামায পরিচালনা করতেন। শুধু তাই নহে, প্রাদেশিক গভর্নরগণকে এ বিষয়ে নির্দেশ দান করা হতো।

সামগ্রীকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরব ভূবনে রসূলে পাকের (সাঃ) আবির্ভাব কাল রাত্রির পর উজ্জল সূর্যোদয়ের মতো, যাঁর আলোক ধারা সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনের অন্ধকার দূর করে দেয়। তিনি বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত আবরদেরকে একত্রিত করে তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে একটি বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন। এইভাবে একটি জাতি গঠন করে একটি Code of low তৈরী করেন এবং এই Code of low শ্রেণী এবং পিতৃ পরিচয় না জেনে সকল জাতিকে সমানভাবে শাসন করেন।

রসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র তাঁর শাসন ব্যবস্থার অনুসরণেরই পরবর্তীকালে বিশ্বের প্রায় সকল শাসকগণের মধ্যে প্রতিফলন ঘটে। মুসলিম শাসকগণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রদর্শিত শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ করে এক ন্যায়নিষ্ঠ সুন্দর ও আদর্শ শাসন ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে সকল ব্যবস্থাই এ শাসন ব্যবস্থায় বর্তমান ছিল। কারণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শাসন প্রণালীর প্রকৃতি মধ্যযুগের অনেক রাষ্ট্র এবং রাজ্যের মতো না হয়ে প্রজাতন্ত্রী বিশিষ্ট শাসন প্রণালী ছিল। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সামাজিক চেতনাবোধ, স্বাধীন মনোভাব এবং শান্তিপূর্ণ ভাব বজায়ই ছিল রসূলে করীম (সাঃ) এর শাসন প্রণালীর অঙ্গ। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর এই প্রদর্শিত পথের অনুসরণেই রয়েছে মানবজাতি তথা সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ ও শান্তি।

আজ জগৎব্যাপী সেই মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রদর্শিত পথ হোক সব মানুষের পথের দীশা। বিশ্বশান্তির অগ্রদূত, উসওয়াতুন হাসানাহ্, আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্ধু ও রসূল, মানবের ত্রাণ কর্তার অনুসরণে বিশ্বে আজ কায়েম হোক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববন্ধতার এক শান্তি-ধাম। এটাই আজ আমাদের একান্ত কাম্য এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই জামা'তে আহ্‌মদীয়া সারা দুনিয়ায় কাজ করে যাচ্ছে।

—মাকসুদা রহমান

আদরের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আশা করি তোমরা ভালই আছ। শীত আসি আসি করছে। এ সময়ে অনেকেরই জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি হয়ে থাকে, তবে সাবধানতা অবলম্বন করলে অনেকটা উপকার হয়। তাই যাতে সহসা ঠাণ্ডা না লাগে সে দিকে দৃষ্টি দিবে, কেমন।

এই 'সীরাতে খাতামান্নাবীঈন (সা:)' সংখ্যায় তোমাদের জন্য থাকছে আমাদের প্রিয় মহা নবী (সা:) সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন-উত্তর, আতফাল ও খুদ্দামের উদ্দেশ্যে মোহ্‌তারম জনাব শ্যাশন্যাল আমীর সাহেব লিখিত দু'টো ছড়া এবং 'সীরাতুন নবী দিবস' উপলক্ষে প্রতি-যোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারকারী প্রবন্ধ এবং কবিতা। এদের পুরস্কার যথা সময়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

প্রথমেই শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী বোন হাবিবা সুলতানা (মুন্নী)-র একটি চিঠি এবং সে প্রসঙ্গে কিছু কথা :—

চিঠিটা নিম্নরূপ :— ২৪-১০-৮৭

নানা ভাই,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আশা করি খোদার ফযলে ভাল আছেন। ছোটদের পাতা আমার খুব ভাল লাগে। আমি প্রতি দিন একবার করে পড়ি। কিন্তু নানা ভাই ১৫ই অক্টোবর সংখ্যায় নামাযের রাকা'আত পড়ে আমি ধাঁধাঁয় পড়ে গেছি। ইসলামী ইবাদত বইতে নামাযের রাকা'আত প্রথমে সুন্নত পরে ফরয এবং শেষে নফল আছে। কিন্তু ছোটদের পাতার প্রথমে ফরয ও পরে সুন্নত আছে। ইসলামী ইবাদত ও ছোটদের পাতার কোন মিল হচ্ছে না। আমরা কোন্‌টি মেনে চলবো এবং কোন্‌টি ঠিক। ছোটদের পাতার আমার সাথী ভাই বোনদিগকে সালাম জানিয়ে দো'আ করতে বলবেন। নানা ভাই, আপনিও আমার জন্য খাস ভাবে দো'আ করবেন। ওয়াসসালাম।

বোন হাবিবা সুলতানা (মুন্নী),

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

তোমার পত্র পেয়ে খুউব খুশী হলাম। বেশী খুশী হলাম তুমি রীতিমত অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে ছোটদের পাতা পড়ো তা জেনে। জাযাকিল্লাহ্‌। তোমার সালাম ছোট ছোট ভাই-বোনদের পেঁাছে দিলাম। আমিও তোমার জন্যে প্রাণ ভরে দো'আ করি আল্লাহ্‌তা'লা যেন তোমাকে প্রাথমিক যুগের সাহাবীয়াদের মত ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের খাদেমা করেন।

তোমার কাছে নামাযের রাকা'আতের ব্যাপারে যে অমিল লেগেছে প্রকৃতপক্ষে কোন

অমিল নেই। ইসলামী ইবাদত পুস্তকে ছক এঁকে প্রত্যেক নামাযের সুন্নত, ফরয এবং নফল রাকা'আতের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। সেখানে নামাযের ধারাবাহিকতা দেখানো হয় নাই। আর ছোটদের পাতায় নামাযের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রত্যেক নামাযের সুন্নত, ফরয ইত্যাদি রাকা'আতের সংখ্যা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ যে ভাবে নামায পড়তে হয়, যেমন ফজরের নামাযে সুন্নত প্রথমে পড়তে হয় এবং ফরয পরে পড়তে হয় আবার মাগরিবে ফরয আগে পড়তে হয় এবং সুন্নত পরে পড়তে হয়। আশা করি বিষয়টি এখন তোমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে। আজ তাহলে এখানেই শেষ করছি। খোদা হাফিয, ওয়াস্‌সালাম

খাকসার,
'নানা ভাই'

প্রশ্ন-উত্তরে আমাদের মহানবী (সাঃ)

প্রশ্ন : কখন এবং কোথায় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন ?

উত্তর : হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আরব দেশের মক্কা নগরে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের আরবী মাসটি ছিল রবিউল আওয়াল। দিনটি ছিল সোমবার। তবে ১২ই রবিউল আওয়াল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেকেই বলেছেন ৯ই রবিউল আওয়াল।

প্র : তাঁ-হযরত (সাঃ)-এর ইস্‌মে জাত অর্থাৎ আসল নাম কি ? আল-ক্বুরআনে এই নাম কতবার এসেছে ?

উ : তাঁর আসল নাম 'মুহাম্মাদ' অর্থাৎ অতীব প্রশংসিত। আল ক্বুরআনে এই নাম ৪ বার এসেছে।

প্র : তাঁর সিফতি বা গুণবাচক নাম কি কি ?

উ : তাঁর গুণবাচক নাম অনেক, কয়েকটি বলা হল, যেমন : আহ্‌মদ (অতীব প্রশংসাকারী) হাশির (সমবেতকারী) আক্বিব (যিনি পরিশেষে আসেন) কাসিম (বণ্টনকারী)।

প্র : রসূল করীম (সাঃ) উত্তরাধিকার সূত্রে কি সম্পদ পেয়েছিলেন ?

উ : পিতা হযরত আবদুল্লাহ্‌র ইন্তেকালের পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে কয়েকটি ছাগল ভেড়া ও উম্মে আয়মন (আসল নাম বারাকা) নামে একটি দাসী পেয়েছিলেন।

প্র : হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কুনিয়াত (পারিবারিক নাম) এবং লকব (পদবী) কি ?

উ : তাঁর কুনিয়াত হ'ল 'আবুল কাসিম অর্থাৎ কাসিমের পিতা এবং লকব হ'ল 'আল আমীন' (বিশ্বস্ত) 'আস সাদীক্ব' (সত্যবাদী)।

প্র : হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেন সেই বৎসরের একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ কর।

উ : এই বৎসর ইয়ামেনের গভর্ণর আবরাহা হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংস করতে আসে। আল্লাহতা'লা তার এই

বিরাট বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন যার উল্লেখ সূরা ফিলে রয়েছে।

প্রঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নাম বলার সাথে কি পাঠ করতে হয়।

উঃ তাঁর নাম বলার সাথে সাথে তাঁর জন্য এই বলে দো'আ করতে হয়—সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম অর্থাৎ তাঁর ওপর আল্লাহ্‌ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

প্রঃ তিনি কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?

উঃ তিনি কুরাইশ বংশে বনি হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রঃ তাঁর পিতার নাম কি?

উঃ তাঁর পিতার নাম ছিল হযরত আব্দুল্লাহ্‌।

প্রঃ তাঁর মাতার নাম কি?

উঃ তাঁর মাতার নাম হযরত আমিনা।

প্রঃ তাঁর পিতা কখন মারা যান?

উঃ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জন্মের কয়েক মাস পূর্বেই তাঁর পিতা মারা যান।

প্রঃ তাঁর মাতা কখন ইন্তেকাল করেন?

উঃ তাঁর মাতা তাঁর ৬ বৎসর বয়সের সময়ই ইন্তেকাল করেন।

প্রঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দুধ-মাতা কে ছিলেন?

উঃ তাঁর নাম হযরত হালিমা সা'দীয়া। তিনি বনু সা'দ গোত্রের মহিলা।

প্রঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দুধ-বোনের নাম কি?

উঃ হযরত হালিমা সা'দিয়ার কন্যা হাযায়ফী বা শাইমা। তিনি শিশু মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে অতি স্নেহ করতেন। তার আরও দুধ ভাই-বোন ছিল তাঁরা হলেন আবদুল্লাহ্‌, আনীসা, হুযায়ফা।

প্রঃ তাঁর দুধ পিতার নাম কি ছিল?

উঃ দুধ-পিতা ছিলেন হযরত হালিমার স্বামী হারিস ইবনে আব্দুল উয্‌যা।

প্রঃ মুহাম্মাদ (সাঃ) কোথায় সাঁতার শিখেছিলেন?

উঃ মায়ের সাথে বাল্যকালে মদীনায় বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং তথায় বনী 'আদীর মহল্লার নিকটে একটি পুকুরে তিনি সাঁতার শিখেছিলেন।

প্রঃ মায়ের মৃত্যুর পর কে তাঁর লালন পালনের ভার নেন?

উঃ তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর লালন পালনের ভার নেন।

প্রঃ দাদা মুত্তালিব কখন মারা যান?

উঃ তিনি হুযুর (সাঃ)-এর ৮ বৎসর বয়সের সময় মারা যান।

প্রঃ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর কে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর দেখা শুনার ভার নেন?

উঃ তাঁর দেখাশুনার ভার নেন চাচা আবু তালিব, যিনি ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর পিতা ছিলেন।

প্রঃ আবু তালিবের ঘরে আঁ-হযরত (সাঃ) কে কি কাজ করতে হত?

উঃ নবীদের সাধারণ সুন্নত পালন করার জন্য তিনি দশ বার বৎসর বয়সে আবু তালিবের মেষ চড়াতেন।

প্রঃ নবী করীম (সাঃ) কৈশোরে কখনও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বিদেশে গিয়ে-

ছিলেন কি ?

উ : হাঁ। বার বৎসর বয়সের সময় চাচা আবু তালিবের সাথে তিনি সিরিয়া গমন করেছিলেন ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে।

প্র : আবু জাহ্‌ল কে ছিল ?

উ : আবু জাহ্‌ল ইসলামের ঘোরতর শত্রু ছিল। সে কোরেশ বংশীয় ছিল। তার আসল নাম ছিল উমর। ঐ সমাজে সে পণ্ডিত ছিল তাই তার লকব বা উপাধি ছিল আবুল হিকাম অর্থাৎ জ্ঞানীর পিতা। কিন্তু ইসলাম ধর্মকে চিনিতে না পারায় এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এর বিরুদ্ধাচরণ করায় ইতিহাসের পাতায় তার নাম আবু জাহ্‌ল অর্থাৎ মূর্খের পিতা হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

আতফালের উদ্দেশ্যে :

বড় পাওয়া

ছোটরা ছোট নয়
অজান্তে বড় হয়।
দেহে ও বয়সে বড় হওয়া
প্রকৃতির আমোঘ বিধান,
জ্ঞানে গুণে বড় হওয়া
কঠোর সাধনার দান।
বড় হও ভাল হও
করি এই দো'আ
তোমাদের বড় হওয়া,
ভাল হওয়া,
আমাদের জন্য হবে
সবচেয়ে বড় পাওয়া

খুদ্দামের উদ্দেশ্যে :

হবো শহীদ হবো গাজী

শুনো যত খুদ্দাম
গতি করো উদ্দাম।
অধঃগতি পায়ে ঠেলো,
অগ্রগতি সাথী করো।
কভু ভুলোনা আল্লাহ্‌ মহান
ভুলোনা রসূলের শান।
জীবনকে করতে সার্থক
হও সত্যের বাহক।
খলীফার পুণ্যময় ডাকে
সাড়া দাও পলকে।
আল্লাহ্‌কে করতে রাজি
হবো শহীদ, হবো গাজী

মোহতরম জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

[বাংলাদেশ মজলিসে খুদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ১৬তম ইজতেমায় পঠিত]

কিশোর মুহাম্মাদ (সাঃ)

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) আরব দেশের মক্কা নগরীতে ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল রোজ সোমবার মুতাবিক ১২ই এপ্রিল মতান্তরে ৯ই এপ্রিল মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরায়েশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম বিবি আমিনা। জন্মের পর তদানিন্তন প্রথা অনুযায়ী মুহাম্মাদকে (সাঃ) হালিমা সা'দিয়া নাম্নী এক ধাত্রী লালন-পালন করেন। তিনি ছিলেন তাঁর দুধ-মাতা। মাতৃগর্ভে থাকা কালেই মদীনা থেকে দেশে ফিরার পথে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স যখন ছয় ৬ বৎসর, তখন তাঁর মাতাও ওফাত প্রাপ্ত হন। এতিম বালক মুহাম্মাদকে (সাঃ) তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিব এবং তাঁর দাদার মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আবু তালিব লালন-পালন করেন। এই ভাবেই জীবনের উষা-লগ্ন থেকেই দুঃখ তাঁর জনমসাথী হ'ল। বাল্যকালে চাচার অভাবী সংসারের প্রয়োজনে তিনি মেষ চরাতেন। তাঁর সাথীরা হৈ-চৈ করে খেলাধুলা করত, কিন্তু তিনি চুপচাপ এক জায়গায় বসে আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং মানুষের এত দুঃখ-কষ্ট কিভাবে দূর করা যায় সে কথা ভাবতেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি তাঁর নম্র স্বভাব এবং সত্যবাদীতার জন্য "আল-আমীন" (বিশ্বাসী) ও আস্‌সাদীক (সত্যবাদী) নামে আরবে পরিচিত হয়েছিলেন। আমরা জানি তাঁর চাচা আবু তালিবের ছিল বেশ কয়েকটি ছেলে মেয়ে, কিন্তু ছিল উশৃংখল। খাবারের সময় শিশু মুহাম্মাদ একা চুপ করে এক পাশে বসে খেতেন। কখনও হৈ হুল্লর করে তাঁর চাচীকে কষ্ট দিতেন না। তাঁর এই অবস্থা দেখে হযরত আবু তালিব তাঁকে বিশেষ ভাবে আদর করতেন। চাচার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকতে তাঁকে চাচার মেষ চড়াতে হতো, এভাবেই মেষ চড়াতে চড়াতে অন্যান্য নবীদের মত মানুষ চড়াতে শিখলেন তিনি। এই বয়সেই তিনি খুব ধ্যান মগ্ন থাকতেন আর এই বিশ্ব প্রকৃতি সম্বন্ধে চিন্তা করতেন-- নিশ্চয় এর একজন স্রষ্টা রয়েছেন, এসব মূর্তি এ অপরূপ সৃষ্টির স্রষ্টা হতে পারে না। এ ভাবেই বাল্যকাল থেকে তাঁর মধ্যে তৌহীদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল।

সততা, ন্যায়নীতি, স্নেহ-ভালবাসা, শ্রদ্ধা ভক্তি এবং সহানুভূতিশীলতা প্রদর্শন করা ছিল তাঁর কৈশোরের চরিত্রের অতি আকর্ষণীয় বিস্ময়কর গুণাবলী। তাঁর সততার আলোকে বিমুগ্ধ হয়ে সমগ্র মক্কাবাসী তাঁকে ছোট বেলা থেকেই সম্মানের চোখে দেখত। তাঁর চাচার সংসারে থাকাকালে বা অন্য কোন সময়ে কোন কর্তব্য পালনে তিনি বিন্দু মাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন নি। ছোটদেরকে স্নেহ-ভালবাসা ও বড়দেরকে শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শনের নিদর্শন তাঁর চেয়ে কেউ বেশী রেখেছে কিনা জানা নাই। অন্যের দুঃখে তিনিও দুঃখ পেতেন, বিশেষ করে গরীবদের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সহানুভূতি। কৈশোর জীবনে এর চেয়ে বেশী আদর্শ কেউ প্রদর্শন করেছে কি না আমরা জানি না। এই সকল গুণাগুণ বিকাশের মাধ্যমেই তিনি যৌবনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। কিশোর মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর হাজারো সালাম।

—হামিদা খাতুন (সায়েমা)
শান্তিনগর, ঢাকা।

মরু-দুলাল

আঁধারের মাঝে জ্বালাতে আলো এলেন যিনি ভুবনে,
সাম্য-মৈত্রী-শিক্ষার বাণী শিখালেন তিনি অন্ধজনে।
মানব কুলের শিরোমনি তিনি খাতামান্নাবীঈন,
মরু-দুলাল যে তিনি রহমাতুল্লীল আলামীন।
জগতের মাঝে এমন আলো জ্বলেনিতো আর কখনো,
সত্যের আলোয় আলোকিত তাই বিশ্ব জননী এখনো।
শাশ্বত আর চিরন্তন নিয়মের বাহক যে হলেন তিনি,
একত্ববাদের শিক্ষা দিয়ে শুনিয়েছেন তাই খোদার বাণী।
জগৎ সৃষ্টি তাঁরই জন্য, সিরাজাম মুনীরা তিনি,
ঐ নামেরই গুণে মোরা পেয়েছি মুসলমানী।
ধন্য হলো মরুভূমি আজ এসেছে মরুর ফুল
তাঁরই পরশে মুগ্ধ হলো তাই গোটা মানব কুল।
যুদ্ধ-বিগ্রহ নিল যে বিদায় মরুর বুক হ'তে,
শান্তির ছায়া নেমে এল তাই খোদার আরশ হ'তে।
ধন্য হলো আরব-মরু, ধন্য জগদ্বাসী,
এসেছে আজ মরু-দুলাল উদিত হয়েছে শশী।

এস, এম, তৌহীদুল ইসলাম
পটুয়াখালী

দো'আর আবেদন

নারায়ণগঞ্জ মজলিসে আনসারউল্লাহ্‌র একজন মুখলেস প্রবীণ সদস্য মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মল্লীক সাহেব বিগত ৭-১০-৮৭ তারিখে এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হইয়া নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁহার কণ্ঠ্য এবং কনুই এর বাঁ দিকের হাড়দ্বয় ভাঙ্গিয়া যায় এবং ডান পায়ের নালা কাটিয়া যায়, যার জন্য সেখানে এগারটি সেলাই হইয়াছে। বার্দ্ধক্য ও রক্তহীনতার কারণে হাড় ভাঙ্গার চিকিৎসার জন্য চিকিৎসকগণ অপারেশন করিতে অপারগতা জানান। ফলে হাসপাতাল হইতে বাড়ী আসিয়া বর্তমানে তিনি প্রাইভেট চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন আছেন।

মল্লীক সাহেব জামা'তের সকল ভাইবোনকে সালাম জানাইয়া তাঁহার জন্য খাসভাবে দো'আর আবেদন জানাইয়াছেন।

মোহাম্মদ ফজলুল করিম মোল্লা।

২৯-৫-৮৭ইং পুরুলিয়া (নাটোর) আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মুয়াল্লিম জনাব হোসেন আহমদ সাহেব পুরুলিয়া জামা'তে মুখালিফাতে প্রহৃত হওয়ার পর হইতে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার সুস্বাস্থ্যের জন্য খাসভাবে দো'আ করিবার জন্য জামা'তের ভ্রাতা ও ভগ্নীদেরকে বিশেষ অনুরোধ করা হইতেছে।

মজিদুল ইসলাম

খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য

নবীকুল শিরোমণি মহানবী (সাঃ) কে আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে "খাতামান্নাবীঈন বলে আখ্যা দিয়েছেন (সূরা আহযাব ৪১ আয়াত)। "খাতামান্নাবীঈন" হওয়া অন্য সকল নবী রসূলগণের উপর তাঁহার (সাঃ) একটি বিশেষ এবং অনন্য বৈশিষ্ট্য। রসূল (সাঃ) নিজেও এটাকে অন্য সকল নবী রসূলগণের উপর তাঁর ছয়টি ফযিলতের মধ্যে একটি বিশেষ ফযিলত বলে গণ্য করেছেন। (মুসলীম শরীফ, কিতাবুল মাসজিদ, ১৯৪ পৃঃ)

আরবী ভাষায় "খাতাম" শব্দের অর্থ 'মোহর' বা 'মোহর করার আংটি (Signet Ring) বলা হয়েছে। সুতরাং খাতামান্নাবীঈনের শাব্দিক তরজমা কুরআন করীমে অনেকেই 'নবীগণের মোহর' করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে 'মোহর'-এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কি? কেন মহানবী (সাঃ) কে 'নবীগণের মোহর' বলা হলো? কিভাবে অথবা কোন অর্থে নবীগণের 'মোহর' হলে তাঁকে মানাবে এবং উক্ত হাদীস শরীফে 'খাতামান্নাবীঈনে' তাঁর (সাঃ) স্বীয় স্বীকৃতি ও ফযিলত প্রমাণিত হবে। কারণ ফযিলত সেটাকেই বলা যাবে যেটাকে প্রমাণ করা যেতে পারে। যেটা প্রমাণ করা যায় না সেটা ফযিলত কি করে হতে পারে? অতএব, আসুন আমরা দেখি যে 'খাতাম' তথা 'মোহর'-এর প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যটি আসলে কি?

সাধারণতঃ 'মোহর' শব্দের অর্থ ও উদ্দেশ্য কোন কিছুকে বন্ধ করা বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, কথাটি ঠিক তা নয় বরং কোন কিছুকে অকৃত্রিম বা প্রকৃত (Authentic) প্রতিপন্ন বা প্রমাণ করার জন্যই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন দপ্তর অথবা পোষ্ট অফিসের চিঠিতে সীল-মোহর লাগান হয়, তাঁর উদ্দেশ্য চিঠিকে বন্ধ করা নয় বরং এই চিহ্নিত বা প্রমাণ করার জন্য সীল-মোহর-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, চিঠিটি কোন্ দপ্তর বা কোন্ পোষ্ট অফিস থেকে প্রেরণ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ভাবে কোন খামের ভিতরে জিনিস রেখে তার মুখ বন্ধ করে মোহর করা অথবা গালা দিয়ে সীল-মোহর করার উদ্দেশ্যও ঐ জিনিসটাকে বন্ধ করা নয়। কারণ, বন্ধত ওটাকে আগেই করা হয়ে গেছে। শুধু তার উপরে মোহর লাগিয়ে বা গালা দিয়ে কতৃপক্ষ দপ্তরের ছাপটি দেয়া হয়, কিন্তু চিঠি বন্ধ করার জন্য নয়, বরং ঐ ছাপ বা সীল-মোর বেশ কয়েকটি কারণে দেয়া হয়ে থাকে, যথা ঃ—

(১) কোন খোলা চিঠির উপরে সীল-মোহর অথবা রাবারষ্ট্যাম্পের সীল এই জন্যই দেয়া হয়ে থাকে যাতে কতৃপক্ষকে বা চিঠির স্বাক্ষরকারী লোকটিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। চিঠির উপরে কোন সীল-মোহর বা স্বাক্ষর না থাকলে, দপ্তরের নামও যদি লেখা থাকে তবুও চিঠিটা গ্রহীতার পক্ষে গ্রহণ যোগ্য নয়। বরং সেটা আইনগত ভাবে বাধ্যতমূলক হতে পারে না।

(২) কোন বন্ধ খামের উপরে সীল-মোহর অথবা গালা সীল-মোহর এই জন্য করা হয় যেন প্রমাণিত হয় যে, এর ভিতরে রাখা চিঠি, বস্তু সমূদয় অথবা যা রাখা হয়েছিল এবং যেমন রাখা হয়েছিল ঠিক তেমনই রয়েছে। কিন্তু যদি ঐ খামের সীল বা মোহর ভাংগা থাকে তবে বলা হবে যে, এই বন্ধ খামকে খোলা হয়েছে বা জাল করা হয়েছে অথবা হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, সুতরাং এমন খাম গ্রহণযোগ্য নয়।

(৩) কোন বাক্সে অথবা কোন কামরায় জিনিস বা আসবাবপত্র রেখে বন্ধ করার পর তালা লাগিয়ে তার উপরে মোহর বা গালা দিয়ে সীল-মোহর করার উদ্দেশ্যও ঠিক তাই যা উপরে (২নং এ বলা হয়েছে)।

মোহরের উল্লেখিত তিনটি উদ্দেশ্য দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হলো যে, কোন কিছুকে মোহর বা সীল করার উদ্দেশ্যে মোহরকৃত জিনিসকে অকৃত্রিম (Genuine) প্রমাণ করা, সত্যতা প্রতিপাদন বা (Authenticate) করা নিছক কেবল জিনিসকে বন্ধ করা নয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কুরআন শরীফে "খাতামান্নাবীঈন" নবীগণের মোহর বলার প্রকৃত অর্থও উদ্দেশ্যও ঠিক তাই। তিনি খোদাতা'লার প্রেরিত সকল আম্বীয়া আলাইহিমুস্ সালাম-এর জন্য 'মোহর' স্বরূপ, যাঁর প্রমাণ স্বরূপই আমরা দুনিয়ার সকল ধর্মের নবীগণকে আজ নবী বলে মানি। তিনি খাতামান্নাবীঈন হয়ে এসে যখন আল্লাহ্-তা'লার এই বাণী ঘোষণা করলেন লাকাদ বা'আসনা ফি কুল্লি উম্মাত্তিন রাসূলান। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেক জাতিতেই রসুল প্রেরণ করেছি (সুরা নাহ্‌ল ৩৬ আয়াত) তিনি নিজেও (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌তা'লা এক লাখ চব্বিশ হাজার আম্বীয়া আলাইহিমুস্ সালামকে এ দুনিয়াতে প্রেরণ করেছন (মিশকাত), তখন মু'মিন মুসলমান আল্লাহ্‌র উক্ত বাণী ও তাঁর কথাকে মেনে নিলেন। সুতরাং দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান আজ হযরত আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস্ সালাম এবং অন্য সকল ধর্মের সম্মানীত নবীগণকে ইসলামের প্রিয় নবী খাতামান্নাবীঈন সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর মোহর করাতে অর্থাৎ তাদের সত্যতা প্রতিপাদন বা Authenticate করাতেই নবী হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

মোহরের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী মহানবী (সাঃ) শুধু তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের সত্যতা মোহর করে স্বীকৃতি দান করেন নি, বরং তিনি তাঁর পরবর্তী কালে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ আলাইহিস সালামের পুনঃআগমনেরও, যিনি নবী হবেন এবং মুসলীম শরীফে এক হাদীসে চারবার তাঁকে নবী উল্লাহ্ ঈসা বলে স্বীকৃতি দান করে গেছেন। তিনি নিজে নিজেই এটা করেন নি, আল্লাহ্‌র বলাতেই করেছেন। কারণ তিনি (সাঃ) নিজে থেকে কোন কথা বলতেন না মাইয়ান্‌তি কু আনিল হাওয়া ইনহুয়া ইল্লা ওহীউ ইউহা" তাঁর সম্পর্কে কুরআন করীম এসেছে অর্থাৎ তিনি (সাঃ) মনগড়া কথা বলেন না শুধু তাই বলেন যা তিনি প্রত্যাদিষ্ট হন। (সুরা নজম : ৪ আয়াত)

—মাজহারুল হক

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শ ঃ আমাদের কর্তব্য

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র জীবনে তাঁর (সাঃ) জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা প্রবাহ এমন নিখুঁতভাবে সুরক্ষিত যে, মানব ইতিহাসে এর কোন নযির নাই। তাঁর (সাঃ) নবী জীবনের পূর্বের ও পরের সকল ছোট বড় কর্মের ও কথার এমনকি নিজ পারিবারিক কথাবার্তাও যেন অবিকল টেপ করে রাখা হয়েছে। আঁ-হযরত (সাঃ) এর পবিত্র জীবনের ঘটনা প্রবাহ এত বিরাট ও বৈচিত্রময় যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় সমস্যা সমূহের সর্বোত্তম সমাধান এবং সকল পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় উপদেশ ও আদর্শ এতে খুঁজে পাওয়া যাবে। আরবের সেই নিরক্ষরতার যুগে তাঁর (সাঃ) জীবনীকে এমন আলৌকিকভাবে সুরক্ষিত করা হয়েছে যে, চিন্তা করলেই বুঝা যায় আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সৃষ্টির বিশেষ কল্যাণার্থেই এরূপ ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে কুরআন মজীদে রহমাতুল্লীল আলামীন, সিরাজুম্‌মুনীর, খাতামান্নাবীঈন এবং আরো বহু উপাধিতে ভূষিত করেছেন। উক্ত এক একটি উপাধির ব্যাখ্যা করলে এক একটি পুস্তক রচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া তিনি (সাঃ) যুবক বয়সেও বর্বর ও নিরক্ষর আরব জাতির কাছ থেকে আল আমীন উপাধি লাভ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা একটি মাত্র নযির যে একটি জাতি তাদের একজন যুবককে এই অমূল্য উপাধিতে ভূষিত করেছে। শুধু যুবক কেন কোন নবী রসূল বা কোন মহাগুণীও কোন কালে উক্ত মহা-সম্মানিত উপাধি কোন জাতি থেকে লাভ করেননি। তাঁর (সাঃ) পবিত্র জীবনাদর্শকে বিশ্ব মানব গোষ্ঠির বিশেষ কল্যাণার্থেই এমন সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে। এ গুঢ় রহস্য, যে জাতি যত শীঘ্র অনুধাবন করে কাজে লাগাতে পারবে, সে জাতিই তত বেশী লাভবান হতে পারবে। এ জন্যই বোধ হয় পাশ্চাত্য জাতি ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনী গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

রসূলে পাক হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, তিনি যে শতাব্দীতে আছেন উহা উত্তম শতাব্দী তৎপর তৎসন্নিহিত শতাব্দী, অতঃপর বক্রযুগ আরম্ভ হবে (মিশকাত)। উক্ত হাদীসের হিসাব মতে বর্তমান মুসলিম সমাজ বক্রযুগের অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে রয়েছে। প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে, মহান ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহের সাথে বর্তমান মুসলিম সমাজের সামান্য মিলও আর বাকি নাই। বরং তার বিপরীত দিকটাই অধিক প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। যেমন (১) ইসলাম অর্থাৎ শান্তি। আল্লাহ্‌তা'লা এ মহান ধর্মের নামই রেখেছেন শান্তি। কেননা ইসলাম ধর্মের মধ্যেই তিনি বিশ্বশান্তির ফরমূলা দিয়েছেন।

যেমন—মুসলিম জাহান একজন খলীফার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ থেকে নিজেদের মধ্যে নিবিড় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববাসীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে। শান্তিপাগল বিশ্ববাসী একশত কোটি মুসলিমের মধ্যে নিবিড় শান্তি দেখতে পেলে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না। কেননা শান্তিই মানুষের পরম কাম্য। কিন্তু মুসলিম জাহান তৎবিপরীত বহু ফিরকায় বিভক্ত হয়ে পরস্পরের মধ্যে কলহ হানাহানি ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে নিজেরাই অশান্তির আগুনে জ্বলছে। বিশ্ববাসীকে শান্তির দিকে আহ্বান জানাবে কোন আদর্শ দিয়ে। আল্লাহ্‌তা'লার দেওয়া ইসলাম নামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সর্বপ্রথমে মুসলিম জাঁহানে শান্তি প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য্য।

(২) ইসলামের একমাত্র উদ্দেশ্য তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করা। তৌহীদ শব্দের অর্থ একত্ববাদ। একত্ববাদের ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠির একতাবদ্ধ থাকার স্বর্গীয় ব্যবস্থাই ইসলাম। যেখানে একাধিক দলে বিভক্ত হওয়ার কোনই ব্যবস্থা নাই। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন "ওয়াতাসিমু বেহাবলিল্লাহে জামিয়াও ওয়ালা তাফার্‌রাকু"—অর্থাৎ তোমরা সমবেত ভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়িয়ে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হইও না।

(৩) ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বজনে ভালবাসা। একদা আরবের যে দুর্দ্ধর্ষ জাতি তাঁর প্রাণের দুশমন ছিল, তারাই পরে তাঁর (সাঃ) ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে ইসলামের জন্য ও তাঁর (সাঃ) জন্য অকাতরে প্রাণ দিয়েছে। ভালবাসার অস্ত্র দ্বারা তিনি (সাঃ) অতি অল্প সময়ে একটি ধর্ম, একটি জাতি ও একটি রাষ্ট্র গঠন করেছেন। মানব ইতিহাসে ইহা একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

আমরা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম তারিখ এবং মাঝে মাঝে সীরাতুন্নাবী মাহফিল করে তাঁর (সাঃ) বিভিন্ন গুণাবলীর বর্ণনা করে শ্রোতাগণ থেকে বাহবা পেয়ে থাকি, কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজের সঙ্গে রহমাতুল্লীল আলামীন উপাধি প্রাপ্ত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র জীবনাদর্শের সাথেত কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা তাঁর (সাঃ) উম্মত দাবী করে থাকি, কিন্তু আমাদের উত্তম আখলাক দ্বারা তা প্রমাণ করতে না পারলে তাঁর (সাঃ) সীরাত বর্ণনা শুধু কিচ্ছা কাহিনীতে পরিণত হয়ে পড়বে।

আল্লাহ্‌পাক রহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর খাঁটি উম্মতকে পবিত্র কুরআনে "খায়রে উম্মত" বলেছেন। তাই এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য কঠোর সাধনা করতে হবে। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন বনী ইসরাইল জাতি ৭২টি ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল কিন্তু আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। তার মধ্যে ৭২ ফিরকা জাহান্নামী হবে এবং একটি ফিরকা জান্নাতী হবে। সাহাবাগণ প্রশ্ন করেন ইয়ারসূলুল্লাহ্‌—ঐ

ফেরকা কোনটি ? আঁ-হযরত (সাঃ) বললেন, "ওমা আলায়না ওয়া আসহাবী" অর্থাৎ—আমি এবং আমার সাহাবাগণ যে পথের উপর রয়েছি। তাঁর (সাঃ) উক্ত হাদীস আমরা বিশ্লেষণ করলে জানতে পারি যে, কুরআনের মাধ্যমে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, বায়তুল মাল ছিল তাঁদের মধ্যে এবং বিশ্বময় ইসলাম প্রচারে তাঁরা আত্ম নিয়োগ করেছিলেন। রসূলে করীম (সাঃ) এর উম্মতে সেই জান্নাতী ফিরকাটি খুঁজে তার পরিচয় লাভ করার জন্য আমাদের আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করা কর্তব্য।

সীরাতুন্নাবী দিবসে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মহান গুণাবলীর আলোচনা তখনই সার্থক হবে, যখন মুসলিম সমাজ হুযুর (সাঃ) এর এই পবিত্র জন্ম তারিখে তাঁর (সাঃ) মহান উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে প্রত্যেক মুসলিম পরিবার প্রধান তার নিজ পরিবারকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র আদর্শে গঠন করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হবেন। বিশ্বে প্রায় দশ কোটি মুসলিম পরিবার যদি নিজ পরিবারকে রহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পবিত্র জীবনাদর্শে গঠন করতে সক্ষম হন, তাহলে ইনশাআল্লাহ্ অল্প দিনের মধ্যেই ইসলামী জ্যোতিতে সারা পৃথিবী আলোকিত হয়ে মুসলিম জাহান ও বাকী দুনিয়া শান্তি ও ভালবাসায় ভরপুর হয়ে উঠবে।

হে খোদাতা'লা, কাদের, জুলজালাল, তুমি নিজ ফযল ও করমে মুসলিম নামী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীকে রহমাতুল্লীল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর খাঁটি উম্মত হওয়ার তৌফিক দান কর! আমীন—সুম্মা আমীন।

ডাঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

শোক সংবাদ

অতি দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, গত ১৮ই অক্টোবর রোজ রোববার রাত ৯টার সময় আমার মা বার্ধক্য জনিত রোগে চাঁদপুর জেলার চর দুখিয়া গ্রামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)

মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স ১০০ বৎসরের উর্ধে ছিলো। এই মহিলা অত্র অঞ্চলের মহিলাদের মধ্যে প্রবীণ আহমদী ছিলেন। তিনি মরহুম মৌলবী মুহীব্বুল্লাহ্ সাহেবের নিকট ১৯৪৬ সনের প্রথম সারির বয়'আতকারিনী ছিলেন। তিনি আহ্‌মদী গয়ের আহ্‌মদী সকলের বিপদে সাহায্য করতেন এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সবাকেই ভাল জানতেন। এতীমদের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম স্নেহ ও মায়া মমতা। গ্রামে কোন গরীব লোক মারা গেলে তিনি তার কাফন দাফনের খরচ দিতেন।

মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে, দুই মেয়ে, নাতী ও নাতনী এবং বহু সংখ্যক আত্মীয় স্বজন রেখে গিয়েছেন। মরহুমার রূহের মাগফিরাত এবং জান্নাতে তাঁর দারাজাত বুলন্দির জন্য মু'মিন ভাইবোনদের খিদমতে দো'আর জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ আবুল কাসেম

এক নযরে মুহাম্মাদ (সাঃ) চরিত

	খৃষ্টাব্দ	হিজরী পূর্ব সন	ঘটনা
১)	৫৭১ *	৫৩	মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম।
২)	৫৭৬	৪৭	মাতা আমিনার মৃত্যু।
৩)	৫৭৮	৪৪	দাদা আব্দুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করেন।
৪)	৫৮২	৪০	চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসায় সিরিয়া সফর।
৫)	৫৯৩	২৯	হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন।
৬)	৫৯৫	২৭	হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর সাথে বিবাহ-বন্ধন।
৭)	৬১০	১২	হিরা পর্বতের গুহায় প্রথম ওহী লাভ। হযরত খাদিজা, হযরত আলী এবং হযরত যায়েদ ইসলাম গ্রহণ করেন।
৮)	৬১৩	৯	হযরত 'উমর ও হামযা (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ।
৯)	৬১৬	৬	কুরাইশদের নির্যাতন চূড়ান্ত পর্যায়ে।
১০)	৬১৭	৫	শি'আবে আবু তালিবে মুসলমানদেরকে অবরুদ্ধ করা হয়।
১১)	৬২১	১	হযরত আবু তালিব এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) আঁ-হযরত (সাঃ)-কে ফেলে চির বিদায় গ্রহণ করেন। আকাবার প্রথম বয়'আত।
১২)	৬২২	০	আকাবার দ্বিতীয় বয়'আত, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর তায়েফে গমন।
১৩)	৬২৩	১	মদীনায় হিজরত করেন প্রিয় নবী (সাঃ)।
১৪)	৬২৪	২	বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে মক্কায় কাবা'র দিকে কিব্‌লাহ পরিবর্তন, বদরের যুদ্ধ, হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর বিবাহ।
১৫)	৬২৫	৩	উহুদের যুদ্ধ, ইমাম হাসান (রাঃ) এর জন্ম।
১৬)	৬২৬	৪	বীরে মা'উনায় ধোকা দিয়ে ৭০ জন হাফিযকে শহীদ করা হয়।
১৭)	৬২৭	৫	আহ্‌যাবের যুদ্ধ।
১৮)	৬২৮	৬	বয়'আতে রিযওয়ান ও হুদায়বিয়ার সন্ধি।
১৯)	৬২৯	৭	বাদশাহ্‌গণের নিকট ইসলামের দাওয়াত, খায়বারের যুদ্ধ।
২০)	৬৩০	৮	মক্কা বিজয়।
২১)	৬৩১	৯	তাবুকের যুদ্ধ।
২২)	৬৩২	১০	বিদায় হজ্জ, আঁ-হযরত (সাঃ) শেষ বিদায় নিয়ে ইহধাম ত্যাগ করলেন (ইন্নালিল্লাহে ..... রাজেউন)

* রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ মাহমুদ পাশা ফালাকী সাহেব বহু গবেষণা করে একটা পুস্তক রচনা করে দেখিয়েছেন হুযুর (সাঃ)-এর জন্ম ৯ই রবিউল আওয়াল রোজ সোমবার, ইংরেজী ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃঃ আল্লামা শিবলী নোমানী, ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ্, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যাক্তিগণও তা সমর্থন করেছেন।

সংকলনে : 'নানা ভাই'

সংবাদ ঃ

আনসারুল্লাহর ইজতেমা উপলক্ষে বাণী

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র প্রিয় সদস্যবৃন্দ,

আস্‌সালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আপনাদের নাযেমে আ'লা সাহেব অনুগ্রহ করে আপনাদের বাৎসরিক ইজতেমায় একটি বাণী দেয়ার জন্য বলেছেন। প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ (আঃ) বয়'আতের জন্য ১০টি শর্ত নির্ণয় করেছেন। তৃতীয় শর্তটি নিম্নরূপ ঃ

"বিনা ব্যতিক্রমে খোদা এবং রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত (১) নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে (২) তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি (৩) দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট (৪) প্রার্থনা করিবে ও ইস্তিগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার (৫) হাম্‌দ ও তা'রিফ (প্রশংসা) করিবে।"

উপরোক্ত শর্ত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, আমাদেরকে পাঁচটি বিভিন্ন কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে ঃ

(১) আল্লাহ্‌ এবং রসূল করীম (সাঃ) এর ইচ্ছানুসারে রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা,

(২) তাহাজ্জুদ নামায রীতিমত আদায় কর,

(৩) নবী করীম (সাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করা,

(৪) ইস্তিগফার পড়ার দৈনিক রুটিন করা অর্থাৎ পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা,

(৫) আল্লাহ্‌র নে'মতসমূহ স্মরণ করা এবং তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করা অর্থাৎ প্রত্যহ তাঁর তসবীহ্‌ও তাহ্‌মীদ করা।

বাংলাদেশের আনসার ভ্রাতৃবৃন্দের প্রতি তাই আমার বাণী এই যে, তাঁরা যেন স্বপরিবারে বয়'আতের তৃতীয় শর্ত যথাযথভাবে পালন করেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকলের উপর আশিস বর্ষণ করুন, আপনাদেরকে জামা'তের খাঁটি সদস্য করুন ও তাঁর জন্যে খিদমত করার তৌফিক দান করুন।

ওয়াসাল্লাম

খাকসার

৮-১০-১৯৮৭

স্বাক্ষর ঃ হামিদুল্লাহ চৌধুরী

সদর

মজলিসে আনসারুল্লাহ

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর ১০ম বার্ষিক ইজতেমা (যা ৮-৯ই অক্টোবর '৮৭ সমাপ্ত হয়েছে) উপলক্ষে মোহতারম সদর সাহেবকে (মজলিসে আনসারুল্লাহ মরকযিয়া, রাবওয়া) একটি 'বাণীর' জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, এই বাণী ১৮-১০-৮৭ তারিখে আমাদের হস্তগত হয়েছে। বাংলাদেশের সকল আনসারুল্লাহর সদস্য, বিভাগীয় নাযেম, জেলা নাযেম, ও স্থানীয় মজলিসের যয়ীমে আলা/যয়ীম সাহেবদের অবগতি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এর বংগানুবাদ উপরে প্রদত্ত হ'ল।

ওয়াস্‌সালাম
খাকসার
স্বাক্ষর—মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশন্যাল মোতামাদ উমুমী
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আতফালুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর ১৬তম বার্ষিক ইজতেমা সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত

অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা, দো'আ ও যিক্‌রে ইলাহীর মনোরম রূহানী পরিবেশের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযলে গত ২৩, ২৪ ও ২৫শে অক্টোবর '৮৭ ইং মোট তিন (৩) দিন ব্যাপী মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ও আতফালুল আহ্‌মদীয়ার ১৬তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিন ব্যাপী এই মহতী ইজতেমার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ন্যাশনাল আমীর সাহেব। শুক্রবার বাদ জুমু'আ উদ্বোধনী ভাষণে তিনি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত খোদ্দাম ও আতফালের উদ্দেশ্যে ইজতেমার গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিজ নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানান। হুযুর (আইঃ)-এর তাহরীক মোতাবেক তিনি সকলকে দায়ী-ইলাল্লাহর কাজে শরীক হওয়ার জন্যও উপদেশ দান করেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী সাহেব আহাদ-পাঠ পরিচালনা করেন।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে জেরে তবলীগ ভাইদের আমন্ত্রন পূর্বক ইজতেমায় নিয়ে আসার জন্য সকল স্থানীয় মজলিসকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক আল্লাহ্‌ তা'লায় ফযলে ঢাকার বাহির হতে প্রায় ২০ জন জেরে তবলীগ ভ্রাতা উক্ত ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন এবং তারা সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে জামা'তে আহ্‌মদীয়া সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আরও সাফল্যের কথা যে, উক্ত জেরে তবলীগ ভ্রাতাদের মধ্য হতে ৫জন ভ্রাতা ইজতেমা চলাকালীন বয়'আত গ্রহণ পূর্বক এই রূহানী সিলসিলায়

দাখিল হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন---আলহামদুলিল্লাহ্‌! ইজতেমার দুই দিন পূর্ব হতেই বিপুল সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল ইজতেমা গাহে উপস্থিত হতে থাকে। এ বছরের উপস্থিতি অন্যান্য সব বছরকে অতিক্রম করেছে। খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার ৪৪টি এবং আতফালুল আহ্‌মদীয়ার ২২টি মজলিস হতে যোগদানকারী খোদ্দাম ও আতফালের সংখ্যা সর্ব মোট ৪৫০ জন ছিল। এর মধ্যে নিয়মিত ৪০০ জন এবং অনিয়মিত ৫০ জন। এছাড়া আনসারুল্লাহর অনেক সদস্যও উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক সাধারণ বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেন ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব মঈনুদ্দীন আহমদ সিরাজী এবং অর্থ বিষয়ক রিপোর্ট পাঠ করেন নায়েমে মাল জনাব খন্দকার মাহবুব উল ইসলাম সাহেব। এর পূর্বে বাংলাদেশে বর্তমান খেলাফতের সার্বিক দিক এবং খেলাফত বাংলা দেশে-এর উপর বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী সাহেব এবং জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব। অতঃপর উপস্থিত বিভাগীয়, জেলা ও স্থানীয় মজলিসের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ৫ম বার্ষিক শূরার জন্য দু'টি সাব কমিটি গঠণ করা হয়। এর পরে ইজতেমার কর্মসূচী মোতাবেক খেলাধূলা প্রতিযোগিতা, অতঃপর নামায মাগরিব ইশা (জমা') অনুষ্ঠিত হয়।

বাদ নামায মাগরিব-ইশা মোহতরাম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব নায়েব আমীর (১) বাঃ আঃ আঃ-এর সভাপতিত্বে তরবিয়তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। রাত ৯টা পর্যন্ত স্থায়ী উক্ত অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর তরবিয়তী জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব মৌঃ সালেহ আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী, মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া, নাজির আহমদ ভূঁইয়া, বি, এ, এম, এ সাত্তার সাহেব এবং সর্ব শেষে সভাপতি সাহেব। তাঁদের বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল যথাক্রমে ইস্তেকামত উন্নতির চাবিকাঠি, মানব জীবনে বিবাহের গুরুত্ব, যিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ, যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে জাতি সমূহের উন্নতি হতে পারে না এবং তরবীয়তে আওলাদ।

অতঃপর রাত ৯-০০ হ'তে ১০-০০ মিঃ পর্যন্ত ভি, সি, আর এ জামা'তে আহমদীয়ার কর্মতৎপরতার প্রদর্শনী, হুযুর (আইঃ) খোৎবার ক্যাসেট শ্রবন এবং রাত ১০ঘটিকায় মজলিসে শূরার সাব-কমিটিদ্বয়ের পৃথক পৃথক দুইটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মজলিসের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রস্তাব আকারে পেশ করেন।

ইজতেমার দ্বিতীয় দিবস শনিবার ভোর ৪টায় বা'জামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। বাদ ফজর খেলাধুলা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নাস্তা পরিবেশন ও দুপুরের খাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে নযম প্রতিযোগিতা, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর ১-৩০ মিঃ হ'তে ৩-০০ মিঃ পর্যন্ত সাব কমিটির রিপোর্ট পেশ এবং আলোচনা। উক্ত অধিবেশনে সাব কমিটিদ্বয়ের প্রস্তাবিত রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং উক্ত প্রস্তাবাবলী প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন পূর্বক সভায় গৃহীত হয়। উক্ত অধিবেশন পরিচালনা করেন জনাব ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব।

বিকালে সকলের আনন্দ উৎফুল্লতার মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগ ও খুলনা বিভাগের মধ্যে ভলিবলের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং চট্টগ্রাম বিভাগ বিজয়ী হন।

অতঃপর বাদ মাগরিব ও ইশা মোহতারম খলিলুর রহমান সাহেব, নায়েব আমীর (২) এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় তরবীয়তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন মোহতারম মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক, মৌঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাদী, ন্যাশনাল কায়েদ, এবং জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব। তাঁরা যথাক্রমে বর্তমান পরিস্থিতিতে দো'আর গুরুত্ব, ইকামতে সালাত, খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং শতবার্ষিকী জুবিলী প্রোগ্রাম বিষয় বস্তুর উপর জ্ঞান-গর্ভ আলোকপাত করেন প্রত্যেকটি বক্তৃতার পর পর শ্রোতাদের প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া হয়। সেই মোতাবেক প্রশ্ন-উত্তর আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। এরপর রাত ১০টা থেকে ১১টা পর্যন্ত সাংগঠনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমার তৃতীয় দিবস রবিবার যথারীতি বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ ও ফজর নামাযের পর তেলাওয়াতে ক্বুরআন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পতঃপর নাস্তা পরিবেশনের পর ৮টা থেকে বক্তৃতা, উর্দু তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পয়গামে-রেসানী ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ২-৩০ মিঃ থেকে ৩-৩০ মিঃ পর্যন্ত মজলিসে শূরা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে মজলিসের ১৯৮৭-৮৮ বর্ষের কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হয়।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে বিকাল ৪-৩০ মিঃ একটি বিশেষ তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন সর্ব জনাব তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেব, জনাব আলহাজ্ব আহ্‌মদ তওফিক চৌধুরী এবং মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। বিষয় ছিল যথাক্রমে বন্দীকালীন অভিজ্ঞতা [২৬শে আগষ্ট হ'তে ১৮ই অক্টোবর], হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আগমনের উদ্দেশ্য, ইতায়াতে নিযাম, ইসলামের প্রথম ১৩ বৎসর এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে জামা'তে আহ্‌মদীয়া। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব। ইহার পরে পরেই শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হয়। পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব খোদ্দাম ও আতফালের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ শুকরিয়া ভাষণ দান করেন। মোহতারম ন্যাশন্যাল আমীর সাহেব বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। উল্লেখ্য যে রাহে মাওলা বন্দী-দেরকেও বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সর্বশেষে মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব আহাদ পাঠ করান ও মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ইজতেমায়ী দো'আর মাধ্যমে এই মহতী ইজ-তেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে চরম মোখালেফাত সত্বেও এই বৎসরের ইজতেমা অন্যান্য সকল বৎসরের ইজতেমা হতে সবদিক দিয়ে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে বহু আনসার, লাজনা এমাউল্লাহর ভগ্নীও যেরে তবলীগ ভ্রাতা উপস্থিত থেকে আমাদিগকে উৎসাহিত করেছেন এবং দো'আয় শামিল হয়েছেন এজন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদের সকলকে যাজায়ে খায়ের দান করুন (আমীন)।

মোহাম্মদ আবদুল হাদী
ন্যাশনাল কায়েদ

সম্পাদকীয়

পরমত সহনশীলতা ঃ খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর আদর্শ

ইসলাম শান্তির ধর্ম--শান্তি ইহার বাহিরে, শান্তি ইহার অভ্যন্তরে। এই শান্তির অগ্রদূত—শান্তির শ্বেত-কপোত হইলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। দুনিয়াতে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে কিন্তু পরমত-এর প্রতি সহনশীলতার ক্ষেত্রে কেহই তাঁহার মোকাবিলায় দাঁড়াইতে পারিবে না। তাঁহার দীর্ঘ তের বৎসরের মক্কী জীবনে যখন তিনি কঠোর যুলুম ও নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন সেই যুগেও তাহা পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তী দশ বৎসরের মদনী জীবনে যখন তিনি পরম সৌভাগ্যশালী শাহেনশাহ্ সেই জীবনেও তাহা পরিদৃষ্ট হয়।

ইসলামের শিক্ষা দেশ-কাল-পাত্র ভেদে সকল নবীর প্রতি ঈমান আনা এবং 'লা নুফাররিকু বাঈনা আহাদীম মিনহুম' অর্থাৎ তাঁহাদের কাহারও মধ্যে পার্থক্য না করা। এই ঘোষণা দ্বারাই সকল ধর্মের ভেদাভেদের প্রাচীর খান খান হইয়া ধুলি লুণ্ঠিত হইল। সকল ধর্ম একই সূত্রে গ্রথিত হইল এবং ধর্মে ধর্মে হানাহানি, ভেদাভেদ চিরতরে বিলুপ্ত হইল, পরমতের প্রতি সহনশীলতার মূল ভিত্তি এই ঘোষণার উপর রচিত হইল।

আল কুরআন ঘোষণা করিয়াছে—এবং আল্লাহ্কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না কেননা তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহ্কে গালি দিবে (সূরা আন'আম ঃ ১০৯ আয়াত) আল কুরআনের এই শিক্ষা আঁ হযরত (সাঃ) যথাযথ ভাবে পালন করিয়া আমাদের জন্য আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

পরমতের প্রতি কেবল তিনি সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্যই শিক্ষা দেন নাই বরং নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলকে মদীনার মসজিদে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া উৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করিয়া গিয়াছেন যাহা আমাদিগকে কিয়ামত কাল পর্যন্ত পথের দিশা দিতে থাকিবে। কিন্তু এই নমুনার প্রতিফলন আমাদের মধ্যে ঘটিয়াছে কি? যখন এই মহামানবের অনুসারীরা কাহারও পূজার মূর্তি বিধ্বস্ত করে বা কাহারও উপাসনালয় জোর করিয়া দখল

করে বা অন্য ফিরকার মসজিদ দখল করে বা তাহাদের বাড়ীঘর লুটপাট করিয়া জ্বালাইয়া পুড়াইয়া দেয় তখন আঁ হযরত (সাঃ) এর এই শিক্ষার মুখে তাহারা কালিমা লেপন করে না কি?

আল কুরআন ঘোষণা করে—লা ইকরাহা ফিদ্দীন অর্থাৎ এই ধর্মে কোন জবরদস্তি নাই (সূরা বাকারাহ্ : ২৫৭ আয়াত) পুনরায় ইহা শিক্ষা দেয়—বল, সত্য তোমাদের রব্বের নিকট হইতে, সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক; (সূরা কাহাফ : ৩০ আয়াত)। এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌তা'লা ঈমান আনা বা অস্বীকার করা মানুষের স্বাধীনতার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। হযরত রসূলে করীম (সাঃ) সর্বদা ইহার উপর আমল করিতেন এবং তাঁহার অনুসারীদিগকেও ইহার উপর আমল করিতে আদেশ দিতেন। কোন এক যুদ্ধে মুসলিম সেনাবাহিনী এমন একদল শত্রুর সম্মুখীন হইলেন যাহারা মিথ্যা কথা বলিত এবং সুযোগ পাইলেই মুসলমানদের উপর চড়াও হইত। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) কৌশলে এমন দলের কোন এক ব্যক্তিকে ধরিয়া ফেলিলেন। ঐ ব্যক্তি রক্ষার কোন পথ না পাইয়া কলেমা তৈয়ব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' পাঠ করিয়া মুসলমান হওয়ার স্বীকৃতি ঘোষণা করিল। 'উসামা (রাঃ) ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে যুদ্ধের ঘটনাবলীর সহিত এই ঘটনাও যখন আঁ হযরত (সাঃ) কানে গেল তখন তিনি 'উসামা (রাঃ) লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে 'উসামা! বিচারের দিন যখন এই ঈমানের ঘোষণা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে তখন তোমার কি হইবে? ইহাতে 'উসামা (রাঃ) বলিলেন—সে কেবল রক্ষা পাওয়ার জন্যই ঈমানের ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) বার বার ঐ কথাই বলিতে থাকিলেন—হে উসামা! যখন এই ঈমানের ঘোষণা তাহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে তখন তোমার কি হইবে? উসামা (রাঃ) বলেন—রসূল করীম (সাঃ) এর এই কথা বার বার শুনিয়া আমার মনে হইতে লাগিল যে, হায়! যদি আমি এখনই ইসলাম কবুল করিতাম তাহা হইলে আমার স্কন্ধে এই পাপ অর্পিত হইত না—(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

এই হইলেন আমাদের আকা ও প্রভু হযরত খাতামান্নাবীঈন (সাঃ)। তাঁহার শিক্ষা পরিপূর্ণ ভাবে একাগ্রচিত্তে আমরা অনুসরণ এবং অনুকরণ করিতে পারিলেই এই ধরনীর ধুলায় জান্নাত রচিত হইতে পারে। দুনিয়ার সকল অশান্তির ধূম্রজাল এক নিমিষে ছিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। রবিউল আওয়ালের এই মহান দিনে আসুন আমরা পরম সহনশীলতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হই।

—০—

আপনার সন্ধানে আছি!

—হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(১) আপনি কি পরিশ্রম করিতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে তের-চৌদ্দ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করিতে পারেন?

(২) আপনি কি সত্য কথা বলিতে জানেন: এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়-জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করে না এবং কেহ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কিচ্ছা শুনাইলে আপনি তাহার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না?

(৩) আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হইতে মুক্ত? মহল্লার গলিতে ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন? বাজারে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব প্রকার ঘোষণা করিতে পারেন? সমস্ত দিন চলিতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকিতে পারেন?

(৪) আপনি কি ই'তিকাফ করিতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে—

(ক) এক স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারেন;

(খ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া তসবীহ্ করিতে পারেন এবং

(গ) ঘণ্টার পর ঘণ্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকিতে পারেন।

(৫) আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করিয়া একা কপর্দকহীনভাবে সফর করিতে পারেন?

(৬) কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তাহারা পরাজয়ের নামও শুনিতে পসন্দ করে না। তাহারা পাহাড় পর্বত কাটিতে তৎপর হয় এবং নদীগুলিকে টানিয়া আনিতে উদ্দত হইয়া পড়ে। আপনি কি ইহার উপযুক্ত এবং আপনি কি মনে করেন যে এইরূপ কুরবানীর জন্য আপনি সদা-প্রস্তুত?

(৭) আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে সমস্ত জগৎ বলিবে, ভুল—আর আপনি বলিবেন, 'শুদ্ধ'। চারিদিক হইতে লোকেরা ঠাট্টা করিবে, কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখিবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বলিবে: 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করিব'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুতধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং আপনি মাথা পাতিয়া বলিবেন: 'এসো, প্রহার কর।' আপনি তাহাদের কাহারও কথা মানিবেন না, কেননা তাহারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন, কেননা আপনি সত্যবাদী।

(৮) আপনি এই কথা বলেন না যে, আপনি পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু খোদাতা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করিয়াছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজেরই দোষের ফলশ্রুতি বলিয়া মনে করেন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়, যে কৃতকার্য হয় নাই, সে আদৌ পরিশ্রম করে নাই।

আপনি যদি এইরূপ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লিগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী।

কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার এক বান্দা অনেকদিন হইতে আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন। হে আহ্‌মদী যুবক! সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে; অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হইতে চলিয়াছে রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হইবে। ['খালিদ', ডিসেম্বর, ১৯৬৪ ইং]

31st October 1987 আহ্‌মদী রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেনঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন —
অর্থাৎ সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনিঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫
সম্পাদকঃ এ, এইচ, মোহাম্মদ আলী আনওয়ার

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya. 4, Bakshibazar Road, Dhaka- 1211
Phone No. 501379, 502295
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.